দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক ভাবনা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বিভিন্ন কালে সমাজের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি , সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের উপায় প্রভৃতিতে এক বিশিষ্টতা দেখা যায়। সাহিত্য মানব মননের স্বরলিপি বিশেষ, তাই দেশ, কাল, সমাজ, পরিবেশ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিতে এক বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। তাই এককালের সাহিত্যের সঙ্গে অপর কালের সাহিত্যের যেমন পার্থক্য থাকে আবার এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্তমান থাকে যা চিরন্তনত্বের দাবী রাখে।

রাজশেখর বসুর বিচিত্রমুখী প্রবন্ধগুলি পাঠ করতে গেলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হই। ''সাহিত্যের ক্ষেত্রে, শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির মধ্যে যদি সুবুদ্ধির অর্থাৎ সরল সবল সুঠাম যুক্তিপুত প্রজ্ঞা-চক্ষু অথচ সরস চিত্তের কথা ভাবি, তা হ'লে প্রথমেই শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।''[১] রাজশেখর বসু সামাজিক মানুষ, তাই সমাজের ছোট খাটো নিতান্ত সাধারণ বিষয়েও লেখক তাঁর শ্যেন-দৃষ্টি রেখেছেন। পাঠকের আনন্দ ও সামাজিক স্বাস্থ্য-উভয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি সদা-জাগ্রত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গভীর তাত্বিক বিষয়ে প্রাবন্ধিকের গভীর জ্ঞান তা সাহিত্যিক বিষয়ক প্রবন্ধে বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে আমরা পাই সাহিত্যিক রাজশেখরের সাহিত্য ভাবনা, গবেষণা কার্যে আমরা সাহিত্য ও ভাষা মাধ্যমকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নিয়েছি। রাজশেখর বসু তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকেও বিশ্লেষণ করেছেন।

সচেতন এবং অনুভূতিশীল ব্যক্তি মানসে সমাজ ভাবনা প্রাসঙ্গিক বটে, আমরা এই সংক্রান্ত প্রবন্ধ আলোচনায় সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণে সমাজ এবং সমাজ ভাবনার প্রকাশ মাধ্যম ভাষা বিচারের চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ সাহিত্য এবং সমাজ আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু প্রাবন্ধিক রাজশেখর, সাহিত্য যেখানে প্রধান পরিচালক শক্তি। প্রথমে আমরা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী আলোচনা শেষে সাহিত্য বিষয়ক মূল প্রবন্ধ আলোচনায় প্রবেশ করিব।

সমাজ বিষয়ক

১) নামতত্ত্ব (১৯২৩)

২) ভদ্র-জীবিকা (১৯২৫)

৩) তিমি (১৯৪২)

৪) প্রার্থনা (১৯৪৩)

৫) তামাক ও বড় তামাক (১৯৪৯)

৬) ভেজাল ও নকল (১৯৫০)

৭) জীবনযাত্রা (১৯৫২)

৮) জাতিচরিত্র (১৯৫৩)

৯) সমদৃষ্টি (১৯৫৪)

১০) অশ্রেণিক সমাজ (১৯৫৪)

১১) আমাদের পরিচ্ছদ (১৯৫৬)

১২) অশ্লীল ও অনিষ্টকর (১৯৫৮)

নামতত্ত্ব (১৯২৩)

লঘুগুরু প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'নামতত্ত্ব'। প্রাবন্ধিক বলছেন, যে নাম নিয়ে তাঁর প্রবন্ধের সূত্রপাত এ নাম হরিনাম নয়, এটি মানবজীবনের এক অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় বিষয়। সমাজের মধ্যে এক ব্যক্তি তার নামের মাধ্যমে সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে।

প্রাবন্ধিক প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন, বাঙালীর নাম কিভাবে কতটা সংক্ষিপ্ত হতে পারে। ইংরেজদের প্রভাবে দেখা যায় মিষ্টার ব্রাউনের নকল হিসাবে মিষ্টার ব্যানার্জি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এত বড় গোষ্ঠীর মধ্যে শুধু মিষ্টার ব্যানার্জি বললে লোক চেনা সহজ হবে না। যদিও পাঁড়াগায়ে অনেক সময় 'বাঁড়ুজ্যে মশায়' বললে মানুষ ব্যক্তিটিকে চিনে নিতে পারে, কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক বলছেন, ''সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক চেনা সহজ।''[২] কিন্তু বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাম যেমন সুরেন্দ্রবাবু বললে চিনতে কিছুটা সুবিধে হয়। অনেকে আবার বাবার নামের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে ছেলের নাম রাখতে চান। উদাহরণরূপে দেখা যায় গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। লেখক বংশগত পদবী কাউকে ছাড়তে বলছেন না, তবে স্বনামে বিখ্যাত ব্যক্তির বংশপরিচয়ের প্রয়োজন নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, কালিদাস, সক্রেটিস এঁরা কোন বংশের ছিলেন সেকথা জানার প্রয়োজনও দেখা যায় না।

প্রাবন্ধিকের দ্বিতীয় প্রশ্ন - নামের সঙ্গে শ্রীযুক্ত হবে কি হবে না। এই জটিল বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, যারা 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহারের বিরোধী তারা বলেন শ্রী অর্থাৎ ভাগ্যবান, এতে সৌভাগ্য গর্ব প্রকাশ পায় তাই অক্ষরটি নিষ্প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, শ্রী শব্দটির অর্থ যাই হোক না কেন সর্বসাধারণের ব্যবহারের ফলে বর্তমানে গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। তাই ইচ্ছানুসারে মানুষ 'শ্রী' বর্জন করতে পারেন,

ইচ্ছে হলে রাখতেও পারেন কারণ 'শ্রী' অক্ষরটি নিতান্ত ছোট।

প্রাবন্ধিক বলেছেন নামের গঠন নিয়েও একটি সমস্যা দেখা যায়। যেমন নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ - এই দুইশব্দ সমাসবদ্ধ না পৃথক, নরেন্দ্রনাথ ষষ্ঠী তৎপুরুষ অর্থাৎ রাজার রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ মনেহয় দ্বন্দ্বসমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্র বটে এবং ফরাসী খিচুড়ি বিশেষ, অর্থ মনেহয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। প্রাবন্ধিক নামতত্ত্বের প্রণালী বিচার করে বলছেন যে মানুষ ব্যাকরণ বা অভিধান দেখে নাম রাখে না, মোট কথা শুনতে ভাল হলেই হল। জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র ইত্যাদি গালভরা নাম রাজা-মহারাজারা বেশি পছন্দ করতেন। উড়িষ্যায় বড় নাম রাখার রীতি দেখা যায় - শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন বর্তমানে বাঙালীরা ছোট নাম পছন্দ করে। ''বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি''[৩] তাই বাঙালীর দেহে আর্যরক্ত থাক বা না থাক এরা বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বেশি পছন্দ করে থাকেন।

প্রাবন্ধিকের মতে নামের ব্যঞ্জনা বা connotation আর একটি বিশেষ বিষয়। প্রচলিত নামের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভাব মনে আসে না। কিন্তু অপ্রচলিত নামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, লেখক পরিহাস করে বলেছেন। ''কালিদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে হইবে রক্ষাকালীর বাচ্চা।''[৪] তাই লেখকের পরামর্শ নামকরণের সময় ভাবার্থের দিকটাও একটু গুরুত্ব দিলে ভাল হয়। আবার পুরুষের নামেও মোলায়ম শব্দের ব্যবহার দেখা যায় - যেমন - রমনী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনী ইত্যাদি। প্রাবন্ধিকের মতে পুরুষের নাম 'জবরদস্ত' হলেই ভাল। মানুষের আমরণ বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবহারের উপযোগী নাম ''টেকসই গরদখোর''[৫] হওয়া বেশি ভাল। যেমন - তরুণকুমার, চঞ্চলকুমার, জ্যোস্নাকুমার প্রভৃতি নাম বিভিন্ন

বয়স ও জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা বেমানান।

মেয়েদের নামের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বলছেন, যে কোন নামই - - - ''বেনারসী শাড়ীর মতই সর্বাবস্থায় সহনীয়।''[৬] তবে মেয়েদের নামের ক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তার বিষয় হল তাদের নামের আগে মিস্ বা মিসেস যোগ করা হবে কি না, যা নিয়ে মাসিক পত্রিকায়ও প্রশ্ন উঠেছিল। প্রাবন্ধিক এই প্রশ্নের উপর পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, ''স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে For sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে।''[৭] বিলাতী ও ভারতীয় সমাজে জীবনযাত্রায় বিস্তর পার্থক্য এবং বিবাহ ব্যবস্থায় ব্যবধান দেখা যায় তাই ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী নারীর নামে মার্কা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রাবন্ধিক মনে করেন না।

প্রবন্ধের শেষে লেখক আর একটি কথা বলেছেন - বাঙালী মহিলাদের নামের শেষে দেবী লেখার বিষয়টি খারাপ নয়। নারীরা দ্বিজবর্ণা হলে নামান্তে দেবী লেখেন, যারা দ্বিজা নন, তারা বিবাহের পর স্বামীর পদবী এবং অনূঢ়া হলে পিতৃপদবী লিখে থাকেন। প্রাবন্ধিকের মতে, ''অবশ্য নারী মাত্রেই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে।''[৮] অল্প পরিচিতা নারীর সঙ্গে হঠাৎ নাম ধরে কথা বলাটা কিছুটা অসম্মানজনক মনে হয় এবং মিস, মিসেস থেকে দেবী শব্দটি যোগ করলে প্রাবন্ধিকের মতে অনেকটা সুবিধে হবে। এখানে প্রাবন্ধিকের নারী সত্তার প্রতি মর্য্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি দেখা যায়।

নামতত্ত্ব প্রবন্ধটি সম্বন্ধে 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় পবিত্র সরকার বলেছেন - ''সরস কৌতুকছলে রাজশেখর নামের লৌকিক ও আক্ষরিক অর্থ যদি কোনোভাবে ব্যক্তি বা সমাজ গ্রহণ করে তাহলে কী বিভ্রাট দাঁড়ায় তা নিয়ে নানা জল্পনা করেছেন। তারই মধ্যে পদবীর বানান, শ্রী ও মিষ্টার, শ্রীমতী ও মিস বা মিসেস ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সংগত

সুপারিশ আছে।"[৯] ''নামের সঙ্গে ব্যক্তি-চরিত্রের মিল-অমিল নিয়ে কৌতুকময় চমৎকার পর্যবেক্ষণে প্রবন্ধটি রাজশেখরের অন্য সত্তা পরশুরামের চরিত্রকেই প্রকাশ করেছে।"[১০]

একটি মানুষ সমাজে তার ব্যক্তি নাম এবং কখনও বা পদবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রকট করে থাকে। 'নাম' বিষয়টি যত ছোট হোক কেন এর মাধ্যমে আমরা সমাজে চিহ্নিত ব্যক্তি হয়ে উঠি। বাঙালী সমাজে নামের ধারার বিভিন্ন প্রচলন, অর্থ, মিষ্টার, শ্রী, মিস্, মিসেস্, দেবী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের পিছনে মানুষের যে গূঢ় মনঃস্তত্ত্ব - তার বিশ্লেষণ লেখক সরস, গল্পচ্ছলে, উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের চোখে তা পরিস্ফুট করে তুলেছেন। বর্তমান বিশ্বে নারী পুরুষকে সমভাবে দেখার যে দৃষ্টি তা এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভদ্র জীবিকা (১৯২৫)

সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, পরিবর্তনের ফলে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন 'ভদ্র জীবিকা'র মত একটি সর্বসাধারণের সমস্যাকে প্রাবন্ধিক এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশের ভদ্রলোকের ভদ্রজীবিকা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, এই সমস্যা থেকে প্রতিকারের উপায় ও জীবিকা নির্বাহের নূতন পথের কথা বিভিন্ন মনীষী চিন্তা করছেন। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য - ''সতর্কতা চাই, ধৈর্য চাই উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চাই।"[১১]

প্রাবন্ধিক বলেছেন, এই সমস্যা শুধু ভদ্র সমাজে নয়, সকল শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান। তবে এই প্রবন্ধে লেখক বলেছেন হিন্দু ভদ্রের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবেন।

'ভদ্র' শব্দটি বিশ্লেষণ - করতে গিয়ে পূর্বে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও অল্প কয়েকটি সম্প্রদায়কে মাত্র বোঝাত। ভদ্রের উৎপত্তি জন্মগত হলেও গুণকর্মের একটা বিশিষ্টতা সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল - জমিদারি বা জমির উপস্বত্ব ভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি। যাজন ও অধ্যাপনা করে অনেক ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করতেন, বৈদ্যরা বিশেষত চিকিৎসা করতেন। অল্পসংখ্যক ভদ্রশ্রেণী রাজকর্মে এবং কেউবা নবাগত ইংরেজ বণিকের অধীনে চাকরি করতেন। ''বাণিজ্যবৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল।''[১২]। ভদ্র গৃহস্থ ধনী বণিককে অবজ্ঞার চোখে দেখার জন্য উভয়ের মধ্যে সদ্‌ভাব থাকলেও ঘনিষ্টতা ছিল না। তাই বণিকদের অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হত। কিন্তু হঠাৎ করে ভদ্রসমাজ আবিষ্কার করল যে ব্যবসা না শিখলে তাদেরও আর চলবে না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা যদিও সেকালে খুব ভাল ছিল না, জীবনে বিলাসিতা কম থাকার জন্য মোটামোটি চলে যেত। তবে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের পথও সুগম হতে দেখা যায়। কেরাণী, সেরেস্তা, উচ্চতর সরকারী চাকুরী আবার কেউ-কেউ উকালতি ডাক্তারির মত স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করলেন।

ইংরেজী শিক্ষায় বাঙালী ভদ্রসন্তানই বিশেষ অগ্রণী থাকায় ভদ্রশ্রেণী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নূতন জীবিকার সন্ধান পেলেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, অর্থাগম ও ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে বিলাসিতা বেড়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রা প্রণালী পরিবর্তিত হতে আরম্ভ হল। ধনীর প্রতিপত্তিতে চমকিত হয়ে সকল ভদ্রসন্তান সেই বিদ্যা শিখতে অগ্রণী হল। একান্নবর্তী পরিবারে একজনের উর্পাজনে অনেকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হত কিন্তু নিজস্ব খরচ বাড়ার জন্য নির্ভরশীল আত্মীয়রা বর্তমানে অবজ্ঞাত হতে লাগলেন।

ফলস্বরূপ চাকরির উমেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। অনেকে পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে সম্মান বৃদ্ধির আশায় ভদ্রজনের প্রদর্শিত পথে যাত্রা শুরু করলেন।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভদ্রের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে এর লক্ষণ দাঁড়াল-জীবনযাত্রার প্রণালী বিশেষ। বিশেষ প্রকার জীবিকা গ্রহণ এই ভদ্রতালাভের উপায়, স্কুল-কলেজের বিদ্যা জীবিকার বাহন এবং জীবিকা হল-চাকুরী। একই পথে অনেক লোক যাত্রা শুরু করল ফলে, ''কূপমণ্ডূকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আহার্য ফুরাইয়াছে।''[১৩]

ভদ্রের সংখ্যা বেড়েছে, ভদ্রোচিত জীবিকাও বেড়েছে তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন ভদ্রের সংখ্যার অনুপাতে জীবিকা ততটা বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা হত সেটাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ছিল। ক্রমে ভদ্রজন থেকে জীবিকার সংখ্যা কমে গেল, ফলে বাধ্য হয়ে ভদ্রজন - ''যাহার নূতন আমদানি হইয়াছে কিংবা যাহার ইংরেজী নামই প্রচলিত, সেরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না।''[১৪]। ফলে আধুনিক ও ইংরেজী নামে পরিচিত ব্যবসাতে ভদ্রজনও মনোনিবেশ করলেন। বিলাতে পাদরি, সৈনিক, নাবিক বিভিন্ন বৃত্তি আছে কিন্তু এদেশে - ''বাঙালি ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি।''[১৫] Banking, Accountancy & Economics বা দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হলেও, প্রাবন্ধিকের মতে ভদ্রজন এই সমস্যা থেকে অনেকটা মুক্তি পাবে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন - বিভিন্ন জনের মতামতের ফলে রোগ নির্ণয়, ঔষধের ফর্দ তৈরী হয়ে এক বৃহৎ কার্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে উপকরণগুলির ভাল করে বিচার করে দেখা উচিত।

প্রথম ব্যবস্থা - সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমেও কাজ শেখানো। অর্থাৎ - ছুতার, কামার,দরজীর কাজ, সুতা কাটা, তাঁত বোনা, নক্শা করা, কৃষি ইত্যাদি

যাদের কৌলিক ব্যবসা তাদের কাছে অবশ্য হিতকর। তবে যারা রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে তাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুব একটা আবশ্যক হবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা - বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা, অর্থাৎ, Mechanical, Electrical, Engineering, Banking, Surveying, Agriculture, Accountancy ইত্যাদি। এর মূল উদ্দেশ্য দেশে নূতন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষিত ভদ্রজনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা। কয়েকপ্রকার নূতন শিল্প শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন - চামড়া, সাবান, কাচ, চীনামাটির জিনিস, রাসায়নিক দ্রব্য, সুতা ও কাপড় রং-এর প্রণালী। কিন্তু উপরোক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সত্যিকারের ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা কতটা সম্ভব হবে তা চিন্তার বিষয়।

ছাত্র অভিভাবকরা জীবিকালাভে সুবিধার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোযোগ দিলেন, যদিও এতে বিশেষ কোন ফল লাভ সম্ভব হল না, কারণ বিজ্ঞান ও কার্যকরী বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''কেমেষ্ট্রী ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।''[১৬]

Technical Education বা শিল্পশিক্ষা অর্থাৎ দ্রব্য উৎপাদনের প্রণালীর পরিচয় লাভ। প্রাবন্ধিক এইখানে একটি সহজ উদাহরণ দিয়েছেন, যে বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাতে রন্ধন শেখা যায় না, তার জন্য দক্ষ ব্যক্তির কাছে সে সম্বন্ধে যথাযথ বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। রন্ধন শিল্পকে চাকরীর ক্ষেত্রে প্রয়োগে বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা যায় না তবে এই শিল্পকে বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হলে - মূলধন, উপযুক্ত স্থান, কাঁচামাল খরিদ, লোক খাটানোর ক্ষমতা, সময়মত বস্তু সরবরাহ করার ক্ষমতা, টাকা আদায়, আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসানের সূক্ষদৃষ্টি এই বিভিন্ন বিষয়ে

দক্ষতা থাকলেই একটি শিল্প-বা ব্যবসায় সফলতা পাওয়া যেতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের পথ দুর্দম এবং শিল্পশিক্ষা পেলেই শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন, Technical Education - নিরর্থক একথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয় তবে অধিক ছাত্র একই পথে জীবিকার সন্ধানে এলে অবশ্যই সমস্যা দেখা দেবে। কারণরূপে প্রাবন্ধিক বলেছেন, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয় এবং এদেশে কারখানাও কম যাতে চাকরির সুবিধা হতে পারে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাংলাদেশে পরদেশীরা দেশী বণিকের হাত থেকে ছোট বড় ব্যবসা কেড়ে নিয়ে নতূন ব্যবসা পত্তন করছে। সেই পরদেশীরা ইংরেজী, economics আধুনিক হিসাব প্রণালী কিছুই জানে না, তারা দেশী, বিদেশী, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, উপকারী, অপকারী - সব ধরণের পণ্যের কেনাবেছা করতে আগ্রহী। ''উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।''[১৭]

প্রাবন্ধিক বলেছেন, একসময় বাঙালী ইংরেজদের মোহে পড়ে তাদের চালচলন অনুকরণের চেষ্টা করেছিল, বাঙালীর সে ভ্রম চলে গেছে। কিছু সংখ্যক বাঙালীর মতে খোট্টার ব্যবসা করলে জীবনযাত্রার প্রণালী নিচু করতে হবে এবং মানসিক উন্নতিরও আশা কম, মূলত নিজের ত্রুটির জন্যই বাঙালীর পতন হচ্ছে। পরদেশী বণিকরা জন্মাবধি বণিক আবহাওয়ার মধ্যে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে এই বিষয়ে দীক্ষা লাভ করেছে। বাজারের গূঢ় তত্ত্বের অভিজ্ঞতা তারা নিজ ঘরেই লাভ করে থাকে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, business atmosphere বাঙালী ভদ্রের পক্ষে পাওয়া দুর্লভ। তাই বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের ঘরে নূতন করে রোপন করতে হবে। প্রথমে সফলতা

না এলেও ধীরে-ধীরে এই পথ সহজ হয়ে উঠবে। ''দালাল আড়তদার ব্যাপারী পাইকার দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে আসে।''[১৮] প্রাবন্ধিকের মতে, এই পথপরিক্রমার মধ্যে অনেক মানুষের অন্নসংস্থান হয় এবং এটি জীবিকার রাজপথ - তাই এই পথের বার্তা বাঙালী ভদ্রলোককে বুঝে নিয়ে নূতন যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। সকল যুবক ব্যবসা করবে তা নয় তবে যারা এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠদ্দশাতে সেই পথে যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। এইক্ষেত্রে দোকান হাট বাজার আড়তের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাহায্য করবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা লাভ হবে এক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ীই সুবিধাজনক কারণ ''সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র আছে।''[১৯] ব্যবসা আরম্ভ করিলেই সফলতা আসবে না তারজন্য অপেক্ষা করতে হবে, পরে অভিজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ব্যবসায় সফলতা লাভ করা যাবে। তার জন্য অবশ্যই কষ্টসহিষ্ণুতা থাকতে হবে এবং বাঙালী ভদ্র ব্যক্তিরা অনেক পরিশ্রম করে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং শেখে তবে যেদিন বাঙালী বুঝবে যে বণিকবৃত্তি হীন নয় সেদিন তারাও কষ্ট সহ্য করে এপথে এগিয়ে যাবে।

প্রাবন্ধিক আশা করেছেন বাঙালীর বুদ্ধি, নিপুণতা ও সৌষ্ঠবজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবসায় ব্যবহার করলে অবশ্যই তারা সফল হবে। অবশেষে প্রাবন্ধিক বাঙালী ভদ্র জাতীদের প্রতি বলছেন - ''নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুকাইবে না। .... ভদ্র জীবিকার প্রতি মোহগ্রস্থ বাঙালি, কীভাবে অর্থনৈতিক শক্তি ও স্বনির্ভর উদ্যেগ হারিয়েছে।''[২০] এই চিত্র প্রবন্ধে দেখা যায়।

প্রবন্ধাবলী গ্রন্থে ভূমিকায় পবিত্র সরকার বলেছেন, 'ভদ্র জীবিকা'-র ভদ্র কথাটিকে তার প্রশ্ন বিদ্ধ করে, এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ধরণেই বাঙালির ওই 'ভদ্র' ধারনার মোহ

তার হাত থেকে কীভাবে অর্থনৈতিক শক্তি ও উদ্‌যোগ অন্যান্যদের হাতে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা লক্ষ্য করেন রাজশেখর। তাঁর একটু আশান্বিত সিদ্ধান্ত, ''বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না।''[২১]

'ভদ্রজীবিকা' প্রবন্ধে লেখক বাঙালী তথা শিক্ষিত সমাজ যে ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন সেই সমস্যাকে পরিস্ফুট করেছেন, তার সঙ্গে সমস্যা সৃষ্টির কারণ এবং কিভাবে সমস্যা উত্তরণ করা যায় সে বিষয়ে যথাযথ ভাষায় বন্ধুর মত পরামর্শ দিয়েছেন। সমাজের মেরুদণ্ড অর্থনীতি, একটি জাতি বা সমাজ যখন সে বিষয়ে একটি প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয় তখন তা সমাজের কাছে এক বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে রাজশেখর বসুর সহমর্মী দৃষ্টি এবং সময়োচিত পরামর্শে যুগ ও সময়ের সঙ্গে মানুষ সাবলীলভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেদিকে লেখক মমতার মাধ্যমে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। লেখক যদিও শুধু বাঙালী জাতির কথা বলেছেন তবে তা সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তিমি (১৯৪২)

প্রাবন্ধিক আধুনিক প্রাণীদের মধ্যে 'তিমি'র কথা বলেছেন সবচেয়ে বড় জীব। জন্তুটি যদিও মহাকায় তবে সাধারণত, ছোট-ছোট মাছ, শামুক ইত্যাদিই তার প্রধান খাদ্য। পুরাণে একটি জলজন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যার নাম তিমিংগিল, তারা তিমিকেও গিলে খায়। পৌরাণিক কল্পনায় তিমিংগিলের ভক্ষক দেখা যায় তিমিংগিলগিল এবং তার থেকেও গিলগিলান্ত নামধারী জন্তু আরও দেখা যায়। প্রাবন্ধিক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, পুরাণকর্তাদের অদ্ভুত প্রাণীবৃতান্ত হলেও তারা Power politics বা মাৎস্যন্যায় বুঝতেন।

আফ্রিকা, ভারত, চীন প্রভৃতি তিমির মত বৃহতাকার হলেও ক্ষুদ্রভোজী বা অল্পে তুষ্ট। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাড, ইটালি, জাপান ইত্যাদি দেশ তিমিংগিল জাতীয় অর্থাৎ অল্পাধিক দেশ কবলিত করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। পরদেশগ্রাস যুগ যুগান্তরের ঘটনা তবে কালক্রমে গ্রস্থ ও গ্রাসকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ''সেকালের তিমিগিলরা সরলস্বভাব ছিল, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গিলত, কোনও সাধু সংকল্পের দোহাই দিত না।''[২২] কিন্তু বর্তমানে তিমিগিলদের চক্ষুলজ্জা আছে, তাই তারা সভ্যতার বোঝা, অনুন্নত দেশের উন্নতি, শান্তি ও সুনিয়ম ইত্যাদি বড়কথার আড়ালে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। নীতিবাক্য ও ধর্মধ্বজী তিমিংগিলদের আধিপত্য এতদিন অবাধ ছিল তবে বর্তমানে নব জীব গোলযোগ বাধিয়েছে, এরা জার্মানি, জাপান তিমিংগিলগিল জাতীয়। এরা চায় তৈরী সাম্রাজ্য - ''জার্মানি চায় সমস্ত ইওরোপ, জাপান চায় সমস্ত পূর্ব এশিয়া''[২৩] পরবর্তীকালে এদের মধ্যে ও বিবাদ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এই তিমিংগিলগিলদের চক্ষুলজ্জা নেই তাদের ব্রত আরও মহৎ। তাই জর্মানি বলে - ''সমগ্র পৃথিবী অতিমানব আর্যজাতির (অর্থাৎ তার নিজের) শাসনে আসবে এই হচ্ছে বিধাতার বিধান ।''[২৪] আবার জাপান দেশ অন্য সুরে বলছে যে, এশিয়ার নির্যাতিত জাতিরা তাদের পতাকার নীচে এসে যেন সমান সমৃদ্ধি লাভ করে। মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধোত্তর সংকল্প পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না তবে কোন-কোন উদার বাণীও শোনা যাচ্ছে - ''কোনও দেশ পরাধীন থাকবে না, স্বভাবজাত সম্পদে কোনও রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার থাকবে না, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনই একমাত্র লক্ষ্য, জাপানী সহসমৃদ্ধি নয়, সর্বজাতিক সহসমৃদ্ধি।''[২৫] উত্তম সংকল্প হলেও কতটা বাস্তবায়িত হবে, তা প্রাবন্ধিক বলেছেন কল্পনা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত, মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে তাদের সুবুদ্ধি দান

করা প্রয়োজন। সম্রাট অশোক সিরিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন, তাকে কোথাও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি কারণ তাঁর কোন দূরভিসন্ধি ছিল না। আবার ইওরোপীয় রাষ্ট্রের প্রচারক পররাজ্যে গেলে পরিণাম বিপরীত হতেও দেখা যায়। বিশ্বরাষ্ট্রসংস্কারকের উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন তাই প্রাবন্ধিকের মতে সংঘর্ষ অবশ্যই বাঁধবে হয়তবা প্রহার ''নিষ্কামভাবে সর্বজনহিতার্থে দেওয়া হবে''[২৬] পরিশেষে দেখা যায় প্রাবন্ধিক রসিকতা করে বলেছেন - ''দুরন্ত জাতির সংযমন, নাবালক জাতির শিক্ষক ও রক্ষক নিয়োগ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধোপকরণের সংকোচ, প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বিভাগ, নূতন অর্থনীতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।''[২৭]

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সকল দেশ ও মানুষের অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য সর্বদেশের ঐশ্বর্য সর্বমানবের উপভোগ্য করা এবং শিক্ষিত করা উচিত। কিন্তু সবাই সমান সুবিধা পেলেও সমান শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে না। উদাহরণরূপে প্রাবন্ধিক বলেছেন, এক ধনবান ব্যক্তির পাঁচ ছেলে সমান সুবিধা পেলে সমান কৃতী হয়ে উঠে না তাই পিতা বেঁচে থাকতে সবাই সুখী থাকলেও পিতার মৃত্যুর পর অকৃতী ছেলেদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই মানবজাতির পিতৃস্থানীয় কে হবে তাও এক সমস্যার বিষয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'ডিমোক্রাসির' উপর সাধারণের আস্থা থাকলেও মূলত মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধূর্ত লোককে রাষ্ট্রসভায় প্রবল হতে দেখা যায়। শিক্ষার প্রসারে জ্ঞান বাড়লেও সাধুতার বড় অভাব, প্রাবন্ধিকের মতে এটি একটি প্রবল বাধা।

'Return to Reason' বই-এ Geoffrey Bourne বলেছেন ডাক্তার উকিলের মত পার্লামেন্টের সদস্যকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, প্রাবন্ধিক ঈষৎ ব্যঙ্গ

করে বলেছেন যে, ''কেবল বিদ্যাশিক্ষায় সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় না, সাধুতাও আসে না।''[২৮]

সংঘবদ্ধ চেষ্টা, বিজ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতা প্রভৃতিতে বহু দেশ সমৃদ্ধ হলেও প্রাবন্ধিক বলেছেন, যে সমাজে বা রাষ্ট্রের ভিন্ন-ভিন্ন উন্নতি হলেও মানুষের চারিত্রিক উন্নতি সামান্যমাত্র হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম, পুণ্যাত্মা কবি ও সাহিত্যিকদের প্রভাবে প্রাবন্ধিকের মতে মানব যে চরিত্রের সামান্য উন্নতি হয়েছে রাষ্ট্র বা বিজ্ঞানের এতে কোন ভূমিকা নেই। কারণ স্বরূপ প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''ব্যক্তির চরিত্র শোধিত না হলে সমষ্টির পরম স্বার্থজ্ঞান আসবে না, নিষ্কলুষ প্রজাতন্ত্র তথা বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থাও হবে না।''[২৯]। সমস্ত মানবজাতির মঙ্গল একসঙ্গে জড়িত, তাই উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধির ঠিকমত প্রসার না হলে সমস্ত ব্যবস্থা পণ্ড হবে।

'তিমি' প্রবন্ধে, ''অতি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিগুলো কীভাবে মানবধ্বংসী হয়ে বিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।''[৩০] এই চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

''এই উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধি'র পিছনে আছে যেমন প্রখর যুক্তি, তেমনই বিশ্বাস, ঘটনা ও আবেগের স্রোত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও মতাদর্শের সংকীর্ণতায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একটি কল্যাণকর বিশ্বানুভব নির্মানের চেষ্টা।''[৩১]

তিমি বৃহৎ শক্তির প্রতীক, তিমিংগিল আরও বৃহৎ শক্তির প্রতীক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক বাস্তবতার চিত্র, বৃহৎ এবং অতিবৃহৎ শত্রুতার আদর্শ, সংকীর্ণতা, ফলশ্রুতি সম্বন্ধে লেখকের নিরাসক্ত দৃষ্টি। তিনি বিভিন্ন যুক্তি ও যথাযথ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। এবং পরিশেষে উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধির মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করেছেন।

প্রার্থনা (১৯৪৩)

প্রার্থনা প্রবন্ধটি যদিও স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে মানবসমাজ ধর্ম বা পূজাকে স্বার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করছে - এই বিষয় শুধু সে কাল নয়, বর্তমান কালেও এরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

প্রাবন্ধিক গল্পচ্ছলে প্রবন্ধের সূচনা করে রামের চাকরি এবং সেজন্য রামের মায়ের আকুতিকে চিত্রিত করেছেন। রাম চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে এবং রামের মা এক টাকা মা কালীকে, মানতা করে রেখেছেন, মা'র কাছে প্রার্থনা যেমন করে হোক রামের চাকরিটা যেন হয়। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধে কাল্পনিক রামের মা এবং মা কালীর কথোপকথন অঙ্কিত করেছেন। এতে দেখা যায় মা কালী বলেছেন, ছেলের নামে মানত করে যে টাকা রাখা হয়েছে তা চাকরী না হলে কি রামের মা, মা কালীকে দেবেন, রামের মার মত হলো সে গরীব মানুষ চাকরি না হলে টাকা কি করে দেবে। রামের মায়ের দাবী সে রোজ পাঁচটা করে জবাফুল দিচ্ছে, তা তো ফিরিয়ে নেবে না। তবে চাকরী না হলে সে ফুলও দেবে না কারণ ফুলের দাম দু পয়সা মা কালী বললেন, তবে কি ঘুষ দিচ্ছ রামের মা-এর উত্তর ঘুষ নয় পূজো। মা কালী যখন বললেন, রাম থেকে অনেক গরীব ছেলে তো আছে, ওরা চাকরী পেলে কি হয়, তখন রামের মা বলল এ সৃষ্টিছাড়া কথা। মা কালী বললেন, চৌধুরীরা মস্ত বড়লোক তারা ঘটা করে চাকরীর জন্য পূজা দিয়েছেন, তাই তাকে চাকরীটা দিলে... রামের মা খ্যাপে গিয়ে বলল ওদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছেন। মা কালী বললেন, রামের মার ঘুষ খেয়ে অন্যকে ফাঁকি দিলে ব্যাপার নয় আবার অন্যের ঘুষ খেয়ে রামকে ফাঁকি দিলে চলবে না। মূলতঃ সর্বাবস্থায় রামের চাকরী হওয়াই রামের মায়ের ইচ্ছা।

চারুবালা শিক্ষিতা, বিপদে পড়ে ভগবানের প্রার্থনা করছেন, স্বামীকে রোগমুক্ত

করার জন্য, কারণ তার স্বামী রোগমুক্ত হলে, ''তাতে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হবে না।''[৩২] ভগবান বললেন, স্বামীর মৃত্যু হলে যোগেন ঘোষাল চাকরী পাবে এবং সস্তায় চৌধুরীরা ওদের বাড়িটা কিনে নেবে। চারুবালার উত্তর, ''ভগবান এত সাংঘাতিক কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না।''[৩৩] ভগবান বললেন তুমি যে রেশমী শাড়ি পরেছ তাতেওতো লক্ষ-লক্ষ পোকার প্রাণ গিয়েছে চারুবালার মতে তার সাধ আহ্লাদ লক্ষ পোকার প্রাণের চেয়েও কি বড় নয়। কিন্তু মানুষ মরলে ভগবানের কি লাভ হয়, ভগবান বললেন যে তা চারুবালা বুঝতে পারবে না। চারুবালার উত্তর - ''কি নিষ্ঠুর''[৩৪]। ভগবান আবার প্রশ্ন করলেন যে দয়াময় বলে সে যে ডাকছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরও কি তাই বলে সে ভগবানকে ডাকবে। সমাধান ভগবান নিজে দিয়েছেন, ''হয়তো আশা কর যে বার বার দয়াময় বললে সত্যিই আমার দয়া হবে।''[৩৫]

প্রাবন্ধিক বলেছেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই সংকট কালে দৈবের উপর নির্ভর করে। কেউ মাদুলি, কবচ, কেউবা প্রার্থনার উপর কারণ, ''বিশ্বাসের সঙ্গে লজিক বা স্ট্যাটিস্টিক্সের সম্পর্ক নেই।''[৩৬] উদ্দেশ্যসিদ্ধিটা বড় কথা, সেখানে ন্যায্য অন্যায্য কোন বিচার থাকবেনা। তাই দেখা যায়, ডাকাতরাও ডাকাতির আগে কালীপূজা করে, ছাত্ররাও পরীক্ষা পাশের জন্য পূজা দেয়, ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ের জন্যও পূজা দেয়, ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ের জন্যও দৈবসাহায্য নেওয়া হয়। প্রাবন্ধিক মানবচরিত্র দেখে বলছেন যে কেউ একথা চিন্তা করে না, ''যে ভগবান ন্যায়বিচার করবেন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই করুণা করবেন।''[৩৭] কারণ প্রত্যহ ''অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয়''[৩৮] দেখা যায় তাই স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করতে কারো আর বাধে না।

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দৈবসাহায্য তাছাড়া দেশব্যাপী রোগ ও বিপদ থেকে

উদ্ধারের জন্য সমবেতভাবে দেবতাকে প্রসন্ন করার পন্থা, নামকীর্ত্তন, মন্দিরে বিশেষ উপাসনা ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। গভর্নমেণ্ট সাধারণতঃ এগুলি থেকে দূরে থাকে, তবে বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে চিত্র অনেকটাই যেন বদলে গেছে, গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে কোন নির্দিষ্ট দিনে সবাই নিজের নিজের ধর্মানুসারে ভগবানের ভজন করবে। এর কারণ হয়ত এত লোকের আবেদন ঠাকুর ব্যর্থ করতে পারবেন না নতুবা প্রজার মনে একটা ভরসা দেখা দেবে।

বিলাতে গীর্জায় বিশেষ বিশেষ উপাসনার দিন বোমাবর্ষণ বেশী হয়। পাষণ্ডদের মত হল, বিরোধী পক্ষও ভগবানের কাছে প্রতিনিয়ত লাগাচ্ছে তাই হয়ত এরূপ ফল হয়। তাই সম্প্রতি কায়দা করে ঈশ্বরের প্রার্থনা দেখা যায় ''ঈশ্বর, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ কর, শুধু বলব - তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।''[৩৯]

হিন্দু সমাজেও কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয়। যদিও মুখে এই কথা বলা হয় কিন্তু অন্তরের কামনা হল - ''ভগবান আমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন।''[৪০]

কিন্তু যাঁরা প্রথম প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন প্রাবন্ধিকের মতে তাদের মনে কোন প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল না। নিষ্কাম ভক্ত ও জ্ঞানী আজও বর্তমান, তাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা হল - ''হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টিতা তোমাতে সঞ্চারিত হোক।''[৪১]

প্রার্থনা প্রবন্ধে পূজা বা ইশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাকে মানুষ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্বির এক সহজ উপায়রূপে গ্রহণ করেছে, রামের মা কালী মাকে ফুল দিচ্ছে ও এক টাকা মানত করে রেখেছে কারণ রামের যাতে চাকরী হয়। চারুবালা ভগবানকে স্মরণ করেছে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য, লক্ষপোকার প্রাণের বিনিময়ে যে রেশমী শাড়ি চারুবালার প্রিয়,

তাতে লক্ষ পোকার প্রাণের মূল্য বড় কথা নয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন সর্বপ্রথম যারা প্রার্থনা করেছিল বা ভগবান ভজনা করেছিল তারা নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, আজও তেমন লোক বর্তমান আছেন।

তথাকথিত আচার-মূল ধর্মের পিছনে যে নিষ্ঠা সেই মনস্তত্ব লেখকের জীবন পর্যবেক্ষণে যে গভীরতা তা থেকে উঠে এসেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সামাজিক এবং ধর্মীয় তত্বের গভীরতা আন্তসর্ম্পককে লেখক উপাদেয় গল্পরসের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন।

তামাক ও বড় তামাক (১৯৪৯)

প্রাবন্ধিক প্রথমেই মানুষ ও জন্তুর প্রভেদে নেশা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ বিড়াল দুধ, মাছ, ভাত, অভাবে হাঁড়ি ঔষধের জন্য ঘাস খেলেও কখনও তামাকের পাতা বা গাঁজা খেতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও বিভিন্ন আবশ্যক জিনিস সংগ্রহ করে কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন মানুষ এতে তৃপ্ত হয় না, কোনও অজ্ঞাত অভাব মিটনোর জন্য সে নেশার শরণাপন্ন হয়।

প্রাবন্ধিক বিভিন্ন প্রকার নেশা যেমন - তামাক, গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতির কথা বলেছেন। তবে এই প্রবন্ধে তিনি শুধু তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার নিন্দুকরা বলেছে, তামাক ক্ষুধা নষ্ট করে, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয় ইত্যাদি। কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন এই কথা কেউ গ্রাহ্য করছেন না কারণ তাদের মতে এই ক্ষতি থেকে তারা যে আনন্দ পেয়ে থাকেন তা অনেক বেশি।

গাঁজাখোররাও বলেছে যে তারাও সঙ্গে আছে। তামাক সেবীরা ধমক দিয়ে বলেছেন যে তাদের সঙ্গে তুলনা হয় না। গাঁজাখোর বলেছে - ''তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক''।[৪২] তামাকসেবীরা বড়লোক তাই আড়ম্বর করে তামাক খান। গাঁজাখোর গরীব - ''তাই তুচ্ছ সরঞ্জামের বড়-বড় নাম রাখিয়াই শখ মিটাই।''[৪৩] তাই ছুরিকে রতন-কাটারি, পিঁড়িকে প্রেম-তক্তি, ন্যাতাকে জামিয়ার এবং গাঁজা ডলার মন্ত্র - বোম্ শঙ্কর কঙ্কর কি ভোলা। প্রাবন্ধিক বলেছেন গাঁজার নেশা আয়োজনেই কাব্যরস - তামাক-খোর পরের প্রস্তুত জিনিস টেনে খুশি। তাই গাঁজাখোরের মতে তামাকসেবী থেকে তাদের আনন্দ আরো বেশি। শরীর একটু বেশি খারাপ হলেও আনন্দের কাছে তা তুচ্ছ।

প্রাবন্ধিক বলেছেন সমাজহিতৈষীরা তামাক ও গাঁজার বচসা শুনে বললেন তা মিটানো শক্ত। তবে বদ-অভ্যাস ত্যাগ করে দু-দলের ভাল খাদ্য খেলে ভাল হবে। কিন্তু এই যুক্তি কেউই মেনে নিতে রাজী হল না। সমাজ হিতৌষীও আর কি করবেন, বললেন পরমায়ু কত কাল যখন বুঝবি তখন দেখবি।

সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারায় 'নেশা' এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ হিতৈষীরা যদিও এর অপকার সম্বন্ধে নেশা-খোরদের ওয়াকিবহাল করতে চাইছেন কিন্তু তামাক ও গাঁজায়-নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি শারীরিক ক্ষতি থেকে নেশায় যে আনন্দ হয় সেদিকে তাদের দৃষ্টি। এই প্রবন্ধে আত্মকথনের মাধ্যমে নেশাখোরদের মানসিকতার চিত্র প্রাবন্ধিক এঁকেছেন। সমাজের বিভিন্ন প্রকার মানুষের ছোট ছোট চাহিদা বা বিকার সেদিকেও লেখকের সূক্ষদৃষ্টির পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। 'নেশা' এই বিশেষ কথাটি বর্তমান সমাজ মানসিকতায় এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে তাই বর্তমানে

বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন, আইন এমনকি শাস্তির ব্যবস্থা করে সমাজকে এই ব্যধি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রবল প্রতিরোধের প্রচেষ্ঠা করা হচ্ছে।

ভেজাল ও নকল (১৯৫০)

প্রাবন্ধিক গল্পচ্ছলে এই প্রবন্ধের সূচনায় নন্দ গোপাল ও তাঁর কথোপকথনকে চিত্রিত করেছেন। নন্দ গোপাল দুধে খুব জল দিচ্ছে-এই কথাটি তাকে বললে তার অভিমত হল সে কোন ভাবেই খদ্দেরকে ঠকাতে পারে না, তাই সে স্বীকার করে পরিষ্কার কলের জল সের পিছু মাত্র আধ পো দেয়, তবে একথাও স্বীকার করে যে যত বেশি মূল্য দেওয়া হোক না কেন মাঝে মধ্যে একটু জল না মিশালে হবে না কারণ সে গরীব মানুষ, যত কড়া আইন হোক না কেন-এসব কিছুকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ব্যবসার দস্তুর অবশ্যই সকলের জানা আছে তাই ''ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই।''[৪৪]

শিউরাম পাঁড়ে এককালের রাঁধুনী হলেও বর্তমানে সে স্বাধীন ব্যবসা করে। প্রাবন্ধিকের কাছে একদিন সে ভাঁইসার ঘি নিয়ে এল, এতে পরিস্কার ভেজাল বোঝা যাওয়ার জন্য সে প্রাবন্ধিকের কাছে স্বীকার করল যে, গ্রামে গোয়ালা কি করেছে সে জানে না তবে গোয়ালা ভাল মানুষ সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছে। কিন্তু প্রাবন্ধিক বললেন যে সেরে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে এবং এমন ঘি তিনি নিজেই বানাতে পারেন কারণ- ''সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।''[৪৫]

দুধ ঘি-এর কালোবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই ওদের লাভ। দুধ-এ যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। প্রাবন্ধিকের মতে ঘি'এর নকল আছে কিন্তু শিবরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম

তাই সহজে নকল ধরা পড়েছে। ওস্তাদ ঘি ব্যবসায়ীরা নরম ঘনতেলে হালকা হলদে রং ও রাসায়নিক ঘি-এর গন্ধ মিশিয়ে বাজারে পাওয়া যায় তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন, যে কোন সস্তা তেলে সরষের গন্ধ মিশিয়ে বাজারজাত করা হয়। এমনকি অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারেল তেলে সরষে তেলের এসেন্স দিয়ে বিক্রি করা হয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে অসাধু তেল ঘি ব্যবসায়ীর নাম ও তাদের জরিমানার কথা দেখা যায়-এরা প্রধানত অখ্যাত দোকানদার। কখনও বা বড় ব্যবসায়ী দণ্ড পেলে ও তার নাম প্রকাশিত হয় না কারণ ''রিপোর্টরদের ঠান্ডা করতে তারা জানে।''[৪৬] প্রাবন্ধিক পরামর্শ দিয়েছেন যে, দন্ডিত লোকর নাম যদি সরকারী বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয় তবে হয়ত ভেজালে কারবারীরা কিছুটা ভয় পেতে পারেন। সরকারী কর্তারা যদি এটুকুও না করেন তবে সাধারণ মানুষ তাঁদেরও সন্দেহ করতে পারেন।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে রেশনের বিভিন্ন জিনিষ যেমন-ময়দা আটা,চাল-সমস্ত কিছুতে ভেজাল দেখা যায়, তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন,''খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।''[৪৭]

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে নিত্য ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে ভেজাল বা নকল দেখা যায়, যেমন-অসময়ে সবুজ মটর, মিষ্টিতে বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ। পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ নির্দোষ রঙ ব্যবহার করা হয় তবে অন্য রং ব্যবহার দণ্ড দেওয়া হয়। প্রাবন্ধিক তাই সরকারী ও মিউনিসিপাল কর্তাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে তারা যেন বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণকে সর্তক করে তোলে। চাপাতা, এলাচ, লবঙ্গ এমনকি ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যেও ভেজাল দেখাযায়, লেখক সবাইকে সে বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন ''মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে''[৪৮] ভেজাল কালোবাজার প্রভৃতি দুষ্কর্মের প্রতি মানুষ ঠিক ততটা সচেতন নয়।

তবে প্রাবন্ধিকের ভরসা যে দেশব্যাপী অনাচার সাধারন লোক নির্বিবাদে মেনে নিলেও কয়েকজন সমাজ হিতৈষীর সাহায্যে এই সমস্যাগুলি থেকে আমরা মুক্তি লাভ করি, উদাহরণস্বরূপ সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ ইত্যাদি। ভেজাল ও নকল বন্ধ করার জন্য প্রাবন্ধিক পরামর্শ দিয়েছেন, ''যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদবোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস বেচবার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন তবে দাম বেশী নিলে ও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন।''[৪৯]

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন। তাই খাদ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য কম স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য খেয়েও থাকতে হবে প্রাবন্ধিকের মতে এই নিকৃষ্ট খাদ্য ধনী ও জ্ঞানী সাবাইকে ভক্ষণ করতে হবে, সরকার ও সেরূপ খাদ্যের প্রচার করবে কিন্তু কখনও অত্যুক্তি করবেন না কারণ, ''মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল''[৫০]। মোট কথা কোন অবস্থায় প্রাবন্ধিক বলেছেন,''সত্যমেব জয়তে-এই রাষ্ট্রিয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়''[৫১]।

'খাদ্য'-বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন খাদ্যের গুণগুণের উপর মানুষের সুস্থ অসুস্থতার ব্যাপার অনেকখানি নির্ভর করে। সমাজ অর্থাৎ গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ-, যে সমাজের মানুষ সুস্থ সবল তারা অবশ্যই একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন করতে পারে। ভেজাল ও নকল প্রবন্ধটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দুবছরের মধ্যে রচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক খাদ্য ব্যবস্থায় যে ভেজালের অতিমাত্রা যে সম্বন্ধে মানুষেকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন।

তাছাড়া যুদ্ধ, মন্বন্তর, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সময়ের সঙ্গে সামাজিক নিয়ম কাঠামোর পরিবর্তন এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রাবন্ধিক দেখেছেন।

জীবনযাত্রা (১৯৫২)

প্রাবন্ধিক প্রথমেই বলেছেন- Plain living and high thinking এই বাক্যেটি যদি ও এককালে বিশেষ শোনা যেত সেখানে বর্তমানে Standard of living শব্দের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। আপাতবিরোধী দুই বাক্যের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে। উচ্চ চিন্তা ও জীবনযাত্রা সরল করা কি সত্যিকারের সম্ভব। উদাহরণ রূপে প্রাবন্ধিক গ্রীক সন্ন্যাসী ডায়োজিনিস-এর জীবন দেখিয়েছেন, তিনি রাতে পিপের ভিতর থাকতেন এবং দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র কিছু ছিল না, মানুষ দয়া করে যা খেতে দিত তাতেই তার দিন চলত। কিন্তু এই জীবনযাত্রা তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয়নি প্রাবন্ধিক বলেছেন বাংলা উঞ্ছ শব্দের মূল অর্থ ছিল-ক্ষেত্রে পতিত ধন্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থ্যাৎ অত্যল্প উপকরনে জীবিকানির্বাহ, বর্তমানে অর্থ দাঁড়িয়েছে-হীন নীচ বা তুচ্ছ। তবে মহাভারতে উঞ্ছবৃত্তিব্রত ধারীর অনেক প্রশংসা দেখা যায়। প্রাবন্ধিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘‘সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আদ্যসাধন,যা না হলে উচ্চ চিন্তা জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না।’’[৫২] তবে উচ্চচিন্তা, জ্ঞানচর্চা, লোকসেবা-এই সমস্ত বিষয় কালে কালে ভিন্ন রূপে প্রাপ্ত হয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন অল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকাল কম তবে বিলাসী লোক ও জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম করতে পারে ঠিক তেমনি অবিলাসী লোকের সৎকর্ম বা উচ্চচিন্তার প্রবৃত্তি না ও থাকতে পারে। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় ‘‘ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়।’’[৫৩]

প্রাবন্ধিকের মতে, ভারতবাসীর অধিকাংশের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই এক প্রধান সমস্যা, সেখানে আদর্শ দূরের কথা অন্ন চিন্তা করে তাদের সারাদিন চলে যায়। বৃত্তি তার যেমনই হোক মনুষ্যচিত জীবনযাত্রার জন্য অত্যাবশ্যক কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু এই জীবনযাত্রার নিম্নতম মান সত্যিকারের কি হবে। বৃত্তিভেদে অবশ্যই কিছুটা পার্থক্য দেখা যাবে। জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের আধুনিক নাম বুর্জোআ) স্বস্তি বা স্বাছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে।''[৫৪] প্রাবন্ধিক নিজের বাল্যকালের চিত্রকেও তুলে ধরেছেন-সেকালে প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া। প্রাবন্ধিকের মতে বর্তমানে অনেক কিছু বদলে গেছে, লেখকের মতে আহার নিকৃষ্ট হলেও সজ্জা নেশা শখ এবং আমোদ মানুষের অনেক বেড়ে গেছে। শৌখিন জামা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রসাধন প্রয়োজন। অনেকবার চা, ত্রিশ-চল্লিশটা সিগারেট, সিনেমা,ফুটবল,ক্রিকেট ম্যাচ দেখা, গ্রামোফোন, রেডিও, গল্পের বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি আধুনিক বা বর্তমান জীবনের অত্যবশ্যকীয় উপাদান। সেকালের সাদামাটা মধ্যবিত্তের জীবনে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দের অভাব ছিল না প্রাবন্ধিক যুক্তি দেখিয়েছেন- ''যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত তার জন্য অভাব বোধ না।''[৫৫] পুরাণ থেকে প্রাবন্ধিক উদাহরণ দিয়েছেন যে ঋষ্যশৃঙ্গ তপোবনে বাবার কাছে সুখেই ছিলেন কিন্তু যখন তিনি লোমপাদ রাজ দূতিদের দেখলেন এবং ভাল লাড্ডু ও পানীয় খেলেন তখনই তাঁর মনে হল এতদিন বৃথা কেটেছে।

প্রাবন্ধিক মজা করে বলেছেন, সেকালের কোন মধ্যবিত্ত লোক যদি মন্ত্রবলে একালের কলকাতায় পৌঁছে যান তবে তিনি বাড়ী ভাড়া চাকরের খরচ ইত্যাদি দেখে

আঁতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের দেখে চটবেন তবে আধুনিক অনেক সুবিধা ও আরাম ভোগ করে খুশী ও হবেন। তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে সেকালের স্থানে যদি একালের লোককে নিয়ে যাওয়া হয় তবে প্রতি মুহূর্তে তিনি অসুবিধায় পড়বেন তাই ভাল ভাল খাদ্য তাকে কোন শান্তি দিতে পারবে না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, একটি জিনিসের প্রচলন ও অভ্যাসের মাধ্যমে জীবনে সেই জিনিসের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ রূপে বলেছেন,পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি মাত্র ছিল, টেলিফোনের ব্যবহার খুব একটা ছিল না পরবর্তীকালে টেলিফোন মোটরকার ব্যবহারে মানুষ অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। কিছু জিনিষ আবার অপরের আছে বলে সম্মান বজায় রাখার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ল। উদাহরণ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক, আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে তাই রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে,। রাসিয়া সামরিক বিমান করেছে তাই আমেরিকাকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলে যেখানে চলে সেখানে অনেকেই এয়ারোপ্লেনের ব্যবহার করেছেন। প্রাবন্ধিক ব্যঙ্গ করে বলেছেন-''জনকতক ধনী হেলিকপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।''[৫৬] অনুকরণ প্রিয় মানুষ সম্বন্ধে এখানে প্রাবন্ধিকের ঠোঁটে যেন বাঁকা হাসি দেখা যায়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সুবিধা, আরাম, বিলাসিতার জন্য শুধু যে নূতন জিনিস প্রচলিত হয়েছে তা নয় অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্য ও তা হয়েছে। উদাহরণ রূপে খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সরকার আইন করে ভুরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু যেহেতু অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে তাই অন্যকেও তা করতে হবে। মদের উচ্চ দাম ও সরকারের নিষেধ থাকলেও উচ্চ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মদ খাওয়া প্রগতির

লক্ষণ হয়েছে, আবার অনেকে বল নাচ শিখছে। তাই বলেছেন—''দেশের লোক কুইট ইন্ডিয়া বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।''[৫৭]

একদেশের জীবনযাত্রায় যা বাড়াবাড়ি তা Necessary অন্যদেশে হতে পারে। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা জীবনযাত্রায় মান বাড়াবার উপদেশ দিয়ে থাকেন। জীবযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে এবং বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হবে।

ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক। সেই প্রবৃত্তি যদি সামর্থ্য ও সমাজের হানিকর না হয় তবে আপত্তির কারণ নেই। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশে দরিদ্রের সংখ্যা বেশি। ব্রিটেনে বিভিন্ন করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেকটা কমছে। এদেশেও বিভিন্ন করের ব্যবস্থা করে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে তবে—বিলাসী দ্রব্য এবং একান্ত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের পার্থক্য ঠিকমত বিচার হয়নি এবং সেভাবে দেশবাসীকেও সংযম শেখানোর চেষ্টা হয়নি।

বর্তমান এদেশে ধনীর সংখ্যা বেড়েছে তারা সৎ অসৎ বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে বিলাসী হয়ে পড়েছেন। তবে দরিদ্রের তুলনায় ধনী অনেক কম। দুর্নীতি ও বিলাসিতা দুইটি সংক্রামক। প্রাবন্ধিকের মতে, চুরি ঘুষের দেশব্যাপী প্রসারের একটি প্রধান কারণ বিলাসিতা।

পাশ্চাত্য অর্থনীতির মূলকথা—Want More,work more, earn more অর্থাৎ আরও কামনা আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার করার কথা বলে। কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা কেবল বাড়ে শান্তি আসে না। তাই কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা এর বিপরীতমুখী চিন্তা করেন তাই প্রাবন্ধিকের মতে লোভ, অসন্তোষ,

প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলে পরদেশ আক্রমণ ও যুদ্ধ বাঁধতে দেখা যায়। কোন রাষ্ট্রের কি আছে তা না দেখে নিজের রাষ্ট্রের আয়-উৎপাদন-সামর্থ্য বুঝে জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, দেশের পুরাতন ঐতিহ্যে আত্মপ্রতারণা না করে জাতীয় চরিত্রের সংশোধন করা বিশেষ জরুরী বিষয়—''মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমিন আবাদি কম দরকারী নয়,''[৫৮] শ্রমিকের কাজের ফল প্রত্যক্ষ কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক উন্নতমানের মানব-জমিন আবাদ করতে পারেন। তাই সরকারের কাছে শিক্ষক শ্রেনী অবজ্ঞাত হওয়ার জন্য প্রাবন্ধিক মর্মাহত হয়েছেন এবং এবিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

জীবনযাত্রা প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক, প্রাচ্য ভোগবাদী জীবনদর্শন প্রাচীন বর্তমান কালের মানবজীবনের দৈনন্দিন চর্যার কথা বলেছেন। গ্রীক সন্ন্যাসী থেকে আরম্ভ করে মহাভারতের জীবন সম্বন্ধে যে আদর্শ এই প্রবন্ধে তা দেখিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি এই বিভিন্ন বিষয়ের প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দৃষ্টি ভঙ্গির বৈপরীত্য লেখক সরস ভাষায় তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করেছেন।

জাতি চরিত্র (১৯৫৩)

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিক ভাইকাউন্ট স্যামুএল-এর কথা বলেছেন। সার হারবার্ট স্যামুএল ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। তিরাশি বছর বয়সে ব্রিটিশ পার্লমেন্ট হাউস অভ লর্ডসে নিজের দেশের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন — এর ভাবার্থ দেখা যায় যে জাতীয় চরিত্র নিয়ে তিনি চিন্তিত। কারণ পূর্বের তুলনায় লাম্পট্য ব্যভিচার বিবাহভঙ্গ বর্তমানে বেড়ে গেছে।

তাছাড়া— "The vices of sodom and Gomarrah appear to be rife among us"[৫৯] তাই আজ ধর্মবুদ্ধি সংকটের মুখে — ধর্মনীতি ক্ষুন্ন হলে সমগ্র জাতিকে তার ফলভোগ করতে হবে। যদি ও মানুষের আচরণে জন্মগত — Gene এর প্রভাব আছে তথাপি তিনি বলেছেন, ''যে সামাজিক পরিবেশে আমরা জন্মগ্রহণ করি তার রীতিনীতি এবং লোকমত অনুসারেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়।''[৬০] এবং সার্বজনীন ধর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত এই বিষয়ে তিনি সবাইকে সচেতন করেছেন।

ফরাসী এবং মার্কিন জাতির দোষ আছে,— অসাধুতা, লম্পট্য, অকর্মণ্যতা, অব্যবস্থিতচিত্ত ইত্যাদি। Earnest Raynend— নামে ফরাসী একজন সম্পাদক New York Time পত্রিকায় অত্যাধিক সুরাসক্তিতে ফরাসী জাতির আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

Times Literary Supplement—এ আমেরিকা জীবনের কথায় জুয়া-জুলুম -ধনবাহুল্য ইত্যাদির ফলে জাতীয় জীবনের মান যে পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে তা বলা হয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে বিভিন্ন বড় বড় পাশ্চাত্য জাতির দোষের ফর্দ শুনে ভারতবাসীর নিশ্চিত ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না কারণ—''দেশের জনসাধারণ যদি নিজের অসংখ্য ত্রুটি শোধনের চেষ্টা না করি এবং প্রজার কর্তব্যে অবহেলা করি তবে কোনও রাষ্ট্রনেতা বা রাজনীতিক দল আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।''[৬১]

প্রাবন্ধিক বলেছেন ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী কতটা এগিয়ে আছে। অনেক বাঙালী ছেলেমেয়ে দেশরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু অনেক কষ্টে অর্জিত স্বাধীন ভারতে আজ যদি কোন শত্রু আক্রমন করে আমরা কি তখন ভিন্ন-জাতির উপর দেশরক্ষার ভার

দিয়ে ঘরে বসে দুর্গানাম জপব এটি প্রাবন্ধিকের একটি প্রশ্ন। লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন দেশরক্ষার শুধু সাহস নয় শিক্ষারও প্রয়োজন তাই তিনি বাঙালী ছেলেরা দেশরক্ষার জন্য যে সেনাবাহিনী গঠিত হচ্ছে, তাতে যোগ দেওয়ার কথা বলেছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে প্রজা থেকে শাসক পর্যন্ত একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল দেশের উপর ছড়িয়ে আছে। শিক্ষক, পিতামাতা, পুলিশ, অফিস-কারখানার কর্মী, খবরের কাগজ, থেকে সাধারণ মানুষ সবাই নিজের কর্তব্য সুস্থভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না কারণ সব কিছুর পিছনে আতঙ্ক তাড়া করছে। শিক্ষকরা ছাত্রদের শাসন করতে ভয় পান, পিতামাতাও সন্তানকে শাসন করতে সাহস পান না, পুলিশ ও উভয় সংকটে পড়েছে নিজের কর্তব্য নিয়ে—'' নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে অকর্মন্য বলা হবে, কর্তব্য পালন করলে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলা হবে।''[৬২] আমাদের দেশের ক্লীবতা ও কর্তব্যবিমুখতা নিয়ে লেখক বিশেষে চিন্তিত।

অত্যাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লব একটি প্রতিকারের উপায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা সবসময় তাদের ভোটারদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাই ভবিষৎ নির্বাচনের কথা মনে রেখে তারা ঠিক কঠোর ভাবে কর্তব্য পালন করতে পারেন না। খবরের কাগজ ওয়ালাদের ও খেপাতে চান না করণ নির্বাচনে তাদের ও এক বিরাট ভূমিকা আছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ করে দেশের সুশাসন ও উন্নতির জন্য প্রাবন্ধিক তার নিজস্ব মত দিতে গিয়ে বলেছেন— ''শাসকবর্গ এবং তাদের সমর্থকগণ যদি নিজ দলের লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে নির্ভয়ে কর্তব্য পালন করেন তবেই বর্তমান অবস্থায় প্রতিকার হবে।''[৬৩]

প্রাবন্ধিক একটি প্রবাদ উল্লেখ করেছেন—''প্রজা যেমন,তার ভাগ্যে শাসন ও তেমনি জোটে।''[৬৪] অর্থাৎ জনসাধারণের কর্তব্যজ্ঞান যতদিন পর্যন্ত না বাড়ে ততদিন

শাসনের উৎকর্ষ হবে না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন পাশ্চাত্য দেশের মত নেশাখোর এই দেশবাসী না হলে একটি প্রবল মানসিক মাদক এদেশে জনসাধারণকে এমন কি শিক্ষক সমাজকে ও অভিভূত করে রেখেছে,বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান ও জীবনযাত্রায় অন্ধ সংস্কারের মতে এদেশের লোকের বুদ্ধি ও মোহগ্রস্থ। দৈব ঔষধ, কুম্ভস্নান পুণ্য, ফলিত জ্যোতিষ, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি অবিজ্ঞান সম্মত বিষয়গুলি অনুকরণের ফলে আমাদের পুরুষকার যেটুকু আছে তা ও দৈবের উপর নির্ভর করে বিনষ্ট হচ্ছে।

মহাভারতে কৃষ্ণ ধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— ''ধারণদ্ধ র্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।[৬৫] অর্থাৎ ধারণ রক্ষণ বা পালন যে করে সেই ধর্ম মূলতঃ সমাজহিতকর বিধিগুলিই ধর্ম, প্রাবন্ধিক এই ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—''বিশ্ববিধানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে মানুষের স্বাভাবিক ভাববৃত্তি বা Emotion তৃপ্ত করতে পারে তার ধর্মাচরণ সর্বতোভাবে সার্থক হয়।''[৬৬]

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাছাড়া বহু মনীষী ও অনুরূপ উপদেশ দিয়েছেন। তবে প্রাবন্ধিকের মতে, আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দই সর্বভারতে কালোপযোগী বলিষ্ঠ ধর্মের প্রচার করেছেন।

বিদ্যালয় ধর্মশিক্ষার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যে ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের হিত সাধন করে জাতিচরিত্রের উন্নতি করে থাকে সেই সর্বসম্মত সর্বাঙ্গীন ধর্ম এই লোকায়ত (Secular) রাষ্ট্রে শিক্ষার অঙ্গ। প্রাবন্ধিকের মতে, শিক্ষকদের শিক্ষার ভার নিয়ে ছাত্রদের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য শেখানো আবশ্যক। শিক্ষকদের কর্মের ফল সদ্য দেখা যায় না। প্রাবন্ধিক শাসনকর্তাদের এই কথা বলেছেন যে শিক্ষকদের যেন

কোন অভাব না থাকে এবং শিক্ষকরা পূর্ণ শক্তি যেন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন।

জাতিচরিত্র প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন, একটা দেশের জাতির চরিত্র শক্তির উপর সেই দেশ ও জাতির উৎকর্ষতা বিচার্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভাইকাউন্ট স্যামুএল বয়সকালের বক্তৃতা থেকে আরম্ভ করে করে, New York Times এর, ফরাসী সম্পাদকীয় Times LIterary Supplement—এ আমেরিকা—এই বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে যে জাতীয় অবনতি তাতে নেশা, লা ম্পট্য, ব্যভিচার, বিবাহভঙ্গ, অকর্মণ্যতা, অব্যবস্থিতাচিত, জুয়া, জুলুম,ধনবাহুল্য—প্রভৃতি বিভিন্ন দোষের কথা দেখা যায়।

প্রাবন্ধিক ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালী জাতি চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন সেখানে একটি জাতির দেশপ্রেম ও সাহসের অভাব, সমস্ত সমাজ একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল যার মধ্যে শাসক শ্রেনী উচ্চপদে নিযুক্ত কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জড়িত। প্রবাদে আছে যেমন প্রজা তেমন শাসক, প্রজারা যদি নিজের চরিত্র শোধন না করে তবে ভাল শাসক পাওয়া ও সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিকের মতে, বাঙালী জাতি মোহগ্রস্থ হয়ে বিচারহীন লোকাচারের অন্ধ অনুকরণে বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই ধর্ম বোঝাতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের কথাও তুলে ধরেছেন। এবং সেখানে ও দেখা যায় যে কর্মে সমাজের উন্নতি হয় তাই ধর্ম-এবং বিবেকানন্দই আধুনিককালে বলিষ্ঠ ধর্মের পথপ্রদর্শক। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের শেষে দেশের উন্নতিতে প্রধান উপাদান ছাত্রসমাজ এবং তাদেরকে সুশিক্ষিত ও ধর্ম অর্থাৎ রাষ্ট্রহিত ও জাতি চারিত্রের উন্নতিতে শিক্ষকের কথা বুঝিয়েছেন। এবং সর্বোতভাবে শিক্ষককে অভাবমুক্ত করে শুধু

শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শাসক বর্গের প্রতি প্রাবন্ধিক আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি দেশের জাতিচরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির চরিত্র যেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন সেই সঙ্গে বাঙালীজাতির অন্তঃসার শূণ্যতার চিত্র যথোপোযুক্ত উদাহরণ ও ভাষার সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন।

সমদৃষ্টি (১৯৫৪)

এই প্রবন্ধের প্রথমে রাজশেখর বসু তাঁর বাল্যকালের একটি চিত্র অঙ্কিত করেছেন। লেখক ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল সম্রাটের বংশধারার ইতিহাস পড়ছিলেন। তাঁর পিতা প্রশ্ন করলেন যে তিনি নিজের পিতা পিতামহ ইত্যাদি বংশধরদের নাম কতটা জানেন কারণ এই 'আপন জন' দের নাম জানা অতি আবশ্যক পিতা ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের নাম মুখস্ত বলে তাঁকে লিখে রাখতে বললেন। এঁরা আপন জন হলেও ''আধুনিক দৃষ্টিতে নগন্য পেটি বুর্জোআ।''[৬৭] কারণ এরা কোন সুকীর্তি বা কুকীর্তি করে ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী আসন লাভ করেন নি। তথাপি পিতা ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত শাখা প্রাশাখায় একটি বিস্তৃত বংশবিবরণ ছাপিয়েছিলেন তাই প্রাবন্ধিককে মাঝে মাঝে পড়ার জন্য দিয়ে দিলেন।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, তিনি বড় হয়ে জানলেন যে সাত পুরুষ সপিণ্ড এবং পরবর্তী সাত পুরুষ সমানোদক,—আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আত্মবর্গের এই ভাবে বিভাগ করা হয়েছে।

প্রাবন্ধিকের মতে পিতৃকুল মাতৃকুল থেকে সন্তানের উৎপত্তি, আধুনিক বিজ্ঞানীরা পুংসম্পর্ক বাদ দিয়ে স্ত্রী প্রাণীর গর্ভধান করে থাকেন। এক্ষেত্রে পিতৃ পরিচয় থেকে মাতা

মুখ্য পিতা গৌণ বা অনাবশ্যক। পিতা মাতা থেকে যে দৈহিক উপাদান পাই তাকে সাধারন ভাষায় রক্তের সম্পর্ক বলা হয়। এই রক্তের সম্পর্ক পিতামহ-মহী, মাতামহ-মহী প্রত্যেকের থেকে সিকি অংশ পাই। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে ঊর্ধ্বতম সপ্তম পুরুষ থেকে ১/৬৪ অংশ এবং চতুর্দশ পুরুষ থেকে ১/৮১৯২ অংশ পাই। একবিংশতিতম পুরুষ থেকে তা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের চেয়ে ও কম। এবং তাতেও আমাদের আত্মীয়তাবোধ তৃপ্ত হয়।

প্রাবন্ধিকের মতে যোগসূত্র যাই হোক সম্পর্ক যত নিকট আত্মীয়তা বোধ তত বেশি। স্থল বিশেষে এই সম্পর্ক বা বোধ আরো বেশি হয়। প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেদের বংশের যোগসূত্র থাকলে মানুষ নিজেকে অনেকসময় ধন্য মনে করে। উদাহরণরূপে প্রাবন্ধিক বলেছেন, বিলাতের অভিজাতবর্গ উইলিয়ম-দি-কংকরার, রবার্ট ব্রুস এবং আমাদের দেশে অদ্বৈত মহাপ্রভু, প্রতাপাদিত্য,সীতারাম রায় প্রভৃতি ব্যক্তির বংশধর হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে মানুষরা গৌরব অনুভব করে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আত্মীয় সবচেয়ে আপনজন তারপর সগোত্র,সবর্ণ,সজাতি,স্বদেশবাসী,সধর্মী। প্রাবন্ধিক উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, গোঁড়া বাঙালী ব্রাহ্মণের কাছে বাঙালী শূদ্র থেকে অবাঙালী অনেক মুসলমানের ভারতীয় হিন্দু থেকে ইরানী, আরবী, তুর্কী মুসলমানকে বেশি আপনজন মনে করেন।

প্রাবন্ধিক বলেছেন ষাট -সত্তর বছর পূর্বে ভদ্র বাঙালীর আর্য হওয়ার মোহ ছিল, কিন্তু ইতিহাস ও নৃবিদ্যার গবেষণার ফলে বুঝে গেল যে বাঙালী (অধিকাংশ ভারতীয়) অতিমিশ্র সংকর জাতি বিভিন্ন জাতি দ্রাবিড়, কিরাত মেঙ্গালায়েড নিষাদ (অষ্টিক) আল্পীয় প্রভৃতির রক্ত ও সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে বহমান উৎপত্তি যাই হোক না কোন একথা বোঝা গিয়েছিল যে ''কৃতিত্বের সম্ভাবনা সব জাতিরই সমান।''[৬৮] কারণ-প্রাবন্ধিক বলেছেন

জন্মে কেউ Herern volk হয় না, মহাভারতের কর্ণের কথা প্রাবন্ধিক উদাহরণ রূপে গ্রহণ করেছেন ''দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।''[৬৯]

প্রাবন্ধিক বলেছেন এচ জি ওয়েনস তাঁর First and last things—গ্রন্থে লিখেছেন যে যত পিছনে যাওয়া যায় তত আমাদের পূর্বপুরুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বজদের মধ্যে আন্তবিবাহ ও অনেক হয়েছিল। এই হিসেবে বিচার করলে প্রাবন্ধিক বলেছেন ''জগতের সমস্ত লোকই আমার জাতি, সপিণ্ড বা সমানোদক না হলেও সমপ্রভব বলা যেতে পারে।''[৭০]

প্রাবন্ধিক বলেছেন, আদিম মানবের পরপ্রীতি বা পরার্থপরতা বেশী ছিল না কিন্তু আধুনিক সভ্য মানুষ যুদ্ধ, মৃগয়া খেলা বিলাস খাদ্য ইত্যাদির জন্য প্রাণিহত্যা করলে ও তাদের মধ্যে স্বজন প্রীতি মানব প্রীতি এবং ইতরজীবপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে— সর্বমানব প্রীতি ও সর্বজীবপ্রীতি আদর্শ ধর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। তবে আদর্শ ও আচরণ ভিন্ন দেশে ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভারতবর্ষের আদর্শরূপ গীতা, মণু, মহাভারত, ভাগবত—প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও অহিংসার বাণী প্রচারিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশেও সভ্য সমাজে এই সমদর্শিতা আদর্শরূপে স্বীকৃতি পয়েছে তাই পাশ্চাত্য আদর্শ ধীরে ধীরে উদার হচ্ছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, টমাস হেনরি হাক্সলি মানবজাতির নীতি এবং আদর্শের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একটি ধর্মনীতি অপরটি সাধারণ মারালিটি। ধর্মনীতি অর্থাৎ অহিংসা, দয়া,সত্য ,অলোভ সমদর্শিতা, পরোপকার—এগুলি সকল ধর্মেই প্রশংসিত উপাদান। হাক্সলি এই নীতি বলতে কস্‌মিক বা নৈসর্গিক বলেছেন। এই নীতির লক্ষ্য স্বার্থসাধন এবং এরজন্য যে পরিমাণ পরপ্রীতি আবশ্যক শুধুমাত্র তার চর্চা করা। হাক্সলির মতে—এই

নীতির জন্য আত্মরক্ষার প্রয়োজন ইতর জীবের গোষ্ঠীবন্ধন এবং আদিম মানব সমাজের উদ্ভব হয়েছে।

ধর্মনীতি বলে—পরের অনিষ্ট করিও না,নিসর্গনীতির মত—স্বার্থসিদ্ধির জন্য করতে পারে। রাজাদের দিগবিজয়, দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য ইত্যাদি নিসর্গনীতির ফল। প্রাবন্ধিক বিভিন্ন দিক বিশ্লেষেণ করে বলেছেন যে সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্ণ অহিংসা ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু হাক্সলির নিসর্গনীতিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে বর্জন করা সম্ভব নয় —''নিঃস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য।''[৭১] তাই ধর্মনীতি ও নিসর্গনীতির মধ্যে একটা সমঝোতা অবশ্যই করতে হবে। তাই দেখা যায় ধর্মে জ্ঞান ও ভক্তি চর্চায় বাধা না থাকলেও এর প্রধান লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলে স্বার্থসাধন এবং যথাসম্ভব জীবে দয়া। মহাভারতেও এই কথা দেখা যায়, চন্ডীদাস ও বলেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের শেষে গিয়ে আশা করেছেন যে মানব ধর্মের ক্রমবিকাশের ফলে সাধারণ মানুষ যথাসম্ভব সমদর্শিতা লাভের উপায় আবিস্কার করার চেষ্টা করবে।

সমদৃষ্টি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নিজের বাল্যকালের পাঠ্যাবস্থায় একটি চিত্র উত্থাপনের মাধ্যমে এক সাধারণ সত্য কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে দেশের ইতিহাস শিক্ষার চেষ্টা করেছেন যে দেশের ইতিহাস শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বংশ পরম্পরার ইতিহাস জানা ও অত্যন্ত জরুরী এই সংম্পর্কে পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গে বংশগত দিক এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় সমাজে নিজেকে পরিচিত করতে বা আধিপত্য বিস্তারে যে পথ অনুসরণ করা হয় তা তিনি পরিস্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং ধীরে-ধীরে মানুষ সমদর্শিতা লাভের উপায় আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেদের জীবন যাত্রাকে সহজ করে তুলবে।

অশ্রেণিক সমাজ (১৯৫৪)

প্রাবন্ধিক অশ্রেণিক সমাজ বা 'ক্লাসলেস সোসাইটি'র সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সভ্য সমাজ এই ধরনের হলে তার অবস্থায় একটি কাল্পনিক চিত্র দিয়েছেন যে, জীবনযাত্রায় মান সকলের সমান হয়ে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে না, কেউ বেশি অর্থ-উপার্জন করলে তা সাধারণের হিতার্থে বাজেয়াপ্ত হবে। সবাই সমান পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন হবে। বিবাহ বা সামাজিক মিলনে সুন্দর-কুৎসিত ও চিকিৎসায় সবাই সমান সুযোগ পারে। তবে বিদ্যা বুদ্ধি বলের পার্থক্য থাকলে ও আর্থিক অবস্থা ও সমাজিক, প্রতিষ্ঠা সবার সমান থাকবে। দুঃসাধ্য রোগ ও বার্ধক্যের জন্য অকর্মণ্য মানুষের ব্যবস্থা রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, অল্পসংখ্যক মানুষ বিপদগ্রস্থ হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমভোগী সংঘ গঠন বা অশ্রেণিক গোষ্ঠি তৈরি করে, উদাহরণ রূপে প্রাবন্ধিক, রোমান সাম্রাজ্যে অত্যাচারিত খ্রীষ্টান সমাজ এবং নাৎসি-বিতাড়িত ইহুদি পরিবারের চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে দেখা গেছে অবস্থার উন্নতি হলে ভেদবুদ্ধি আবার দেখা যায়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে হিন্দু সমাজে এই ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। যেমন—অব্রাহ্মণের বাড়িতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না। অল্প গোঁড়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যকায়স্থদি ভদ্রশ্রেণীর নিমন্ত্রন রক্ষা করেন। আরও উদার যারা তাঁরা বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ভোগে পঙতিবিচার করলেও সর্বত্র করেন না। আরও সংস্কার মুক্তরা কোন ক্ষেত্রেই ভেদ করেন না, তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন—এই ভেদ ও ক্রমশ কমে আসছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ দূর করার জন্য ধর্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে যেমন—বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়

বিশেষ স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কার মুক্ত ছিলেন বর্ণভেদ মানতেন না। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন না — ''এঁরা উচ্চনীচ সকলের জন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ধর্মমতের সংকীর্ণতা নিরসনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেননি।''[৭২] প্রাবন্ধিক রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারে সাহসী জনহিতব্রতী বিবেকানন্দের সমতুল্য ব্যক্তি প্রাবন্ধিকের মতে আর কেউ নেই।

একসময় এদেশে শুধু ভদ্রশ্রেণী উচ্চশিক্ষা ও ভদ্রোচিত জীবিকার সুযোগ পেত, প্রাবন্ধিকের মতে শিক্ষা ও জীবিকার এই বৈষম্য প্রায় কমে আসছে। প্রাবন্ধিকের মতে শিক্ষা ও প্রচারের ফলে জাতি-বর্ণ-বংশগত ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে কিন্তু শুচিতার ধারণা দেশভেদে বিভিন্ন হয়। ভারতবাসী আহারের পর আচমন, প্রত্যহ স্নান ও মলত্যাগের পর জলশৌচ করে থাকে আবার অনেক ইওরোপীয় নারী তার সন্তানের মুখ থুথু দিয়ে পরিস্কার করে থাকে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন শুচিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতবাসীর অনেক বদভ্যাস দেখা যায়, যেমন বড় সত্তদাগরী অফিসে সাহেব ও দেশী কর্মচারীর জন্য আলাদা সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে দেশী সিঁড়ির স্থানে স্থানে পানের পিক দেখা যায় কিন্তু সাহেবী সিঁড়ি পরিচ্ছন্ন - ''যারা পরিচ্ছন্নতা চায় তাদের পৃথক সিঁড়ি আর পৃথক সমাজ না হলে চলে না।''[৭৩]

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, জাতি, অপরিচ্ছন্নতা, আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি, বিত্ত, সমাজ ধর্ম, দেশ, রাজনীতি - প্রভৃতির জন্য প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশে

শ্রেণীভেদ দেখা যায়। বিবাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণতঃ সমশ্রেণীর বিবাহ বেশী পছন্দ করে।

শিক্ষা ও প্রচারের ফলে প্রাবন্ধিকের মতে সমাজ ভবিষ্যৎ-এর একটি অনুমানিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন -

(১) বিদ্যা, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনে সকল মানুষের সমান সামর্থ্য থাকে না।

(২) সরকারী চেষ্টা ও অনুকূল লোকমতের জন্য ভারতবর্ষে অস্পৃশতা দূর হবে।

(৩) যৌথ পরিবার লোপের ফলে অসবর্ণ বিবাহ বহুপ্রচলিত হবে এবং ভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে বিবাহ বৃদ্ধি হবে।

(৪) শিক্ষার, বিস্তার এবং অধিকতর সংসর্গের জন্য আকৃতি পরিচ্ছদ, ভাষা খাদ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম-পার্থক্য ইত্যাদির জন্য বিরাগ কমে যাবে।

(৫) সম বিদ্যা রুচি বৃত্তি বা রাজনীতির মানুষ সংঘ ক্লাব ও ইউনিয়ন গঠন করবে।

(৬) অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সামাজিক বৈষম্য দূর হবে কিন্তু ধনবৈষম্য দূর হবে না।

(৭) ভারতবাসীর অপরিচ্ছন্নতা দূর করার জন্য প্রচার হলে ভাল হবে, সংবাদপত্রও এদিকটা খেয়াল রাখতে পারে।

(৮) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিবাহ বাড়লে ও তা বহু প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ রুচিভেদে দুইদেশের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশী।

প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাঁর মনে হয়েছে যে পূর্ণমাত্রায় অশ্রেণিক সমাজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে সামাজিক পরিবর্তন হলেও সকল রাষ্ট্রে তা সমানভাবে হবে না।

অশ্রেণিক সমাজ প্রবন্ধটি স্বাধীন ভারতবর্ষে রচিত হয়েছিল, সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন, শিক্ষায় সকলের অধিকারের ফলে মানসিকতায় উদারতার ফলে অসবর্ণ বিবাহ বর্তমানে বৃদ্ধি পেলেও সম্পূর্ণরূপে অশ্রেণিক সমাজ সৃষ্টি হওয়া প্রাবন্ধিকের মতে সম্ভব হবে না।

''অশ্রেণিক সমাজ তাঁর কাম্য, কিন্তু তাঁর নির্মাণ যে কত কঠিন সে সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা আছে তাই আলোচনা ও প্রশ্নের গন্ডি তিনি পেরোন না, সমাধান দেন না।''[৭৪]

''শ্রেণিহীন সমাজ কাম্য হলেও তার বাস্তব রূপায়ণে কতো বাধা''[৭৫]

প্রাবন্ধিকের সময়কাল ও বর্তমান সময়েও সমাজে সম্পূর্ণরূপে অশ্রেণিক সমাজ তৈরী হওয়া কঠিন, কারণ সমাজে যতই বদল হোক না কেন তাতেও একটা মূল কেন্দ্রবিন্দু থাকে যা সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে সম্পূর্ণরূপে একাকার করে দিতে পারে না। সমাজ সচেতন এবং বাস্তববাদী প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু তাই একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে অশ্রেণিক সমাজের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন কোন সমাধান সূত্র তাই তিনি আমাদের হাতে তুলে দেননি। সমাজ নিরিখের উদার একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এই প্রবন্ধে উপলব্ধি করি। তবে সমাজ যে একটা বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন তার পূর্বনির্দেশ আমরা এখানে দেখি। বর্তমান সময়ে তাই এই প্রবন্ধের তাৎপর্য কম নয়।

আমাদের পরিচ্ছদ (১৯৫৬)

স্বাধীন ভারতবর্ষে এই দেশের মানুষের পোষাকের উপর জওহরলাল নেহরু এক বক্তৃতায় বলেছেন যে ইওরোপীয় পোশাকের উপর ভারতবাসীর ঝোঁক তাঁর পছন্দ নয়। প্রাবন্ধিক এই প্রসঙ্গে নেহরুর বিদেশে যে পোষাকগুলি পরেছেন তার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে সর্বাবস্থায় সাহেব বেশ তাঁর অপছন্দ হলেও অবস্থানুসারে বিলাতী বা দেশী-বিলাতীর মিশ্র পোষাকে নেহরুর সম্মতি আছে।

প্রাবন্ধিক হিন্দি প্রবাদ-নিজের রুচিতে খাওয়া ও পরের রুচিতে পরা, এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে নিজের রুচিতে হলে বাধা পাওয়া যায়। উদাহরণরূপে প্রাবন্ধিক নিজে দরজিকে ফরমাশ করেও গতানুগতিকতার বাইরে কাপড় তৈরি করাতে পারেননি।

প্রাবন্ধিক বলেছেন বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে এখানে তিনি আলোচনা করবেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, পরিচ্ছেদের রুচি প্রধানতঃ তিনটি কারণে প্রভাবিত হয় - (১) গতানুগতিক রীতি (২) সাময়িক ফ্যাশন হুজুক বা বিখ্যাত লোকের আদর্শ (৩) স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জ্ঞান। আর্থিক অবস্থাও পরিচ্ছেদ প্রভাব ফেলে থাকে।

গতানুগতিক বা সময় বদলের সঙ্গে পোষাকের রীতি পরিবর্তিত হয়। ভদ্র বাঙালীর পরিচ্ছদ ধুতি, পিরান, চাদর, কোরতার ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাজ ধুতি, পাঞ্জাবী এবং চাদর ব্যবহার ইচ্ছাধীন ছিল পরিবর্তিকালে সাহেবী সাজ সম্ভ্রান্ত পোষাকের স্থান পেল। প্রাবন্ধিক বলেছেন - ''স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশী রুচি লুপ্তপ্রায় হয়েছে''[৭৬]।

প্রাবন্ধিক আমাদের উপযুক্ত পরিচ্ছদ বিচারের আগে কতগুলি বিষয় মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন।

(১) কর্ম ও ঋতু - ভেদে পরিচ্ছদ পরিবর্তিত হয়।

(২) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্য পরিচ্ছদ ভিন্ন হতে পারে তবে প্রাবন্ধিকের মতে সর্বভারতীয় মিলনের জন্য কিছু সাম্য থাকা উচিত।

(৩) ইওরোপের পোষাক সর্বজাতিক ভব্য পরিচ্ছদ হয়ে পড়েছে, এই পোষাকেও স্বাস্থ্যের অনুকূল ও সুবিধাজনক সংস্কার করা উচিত।

জীবিকা অনুসারে পরিচ্ছদ বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ডাক্তার বিজ্ঞানী যন্ত্রী ইত্যাদি যাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাদের পক্ষে ধুতির চেয়ে পাজামা বা ইজার সুবিধাজনক। প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভারত সরকারের সাধারণতঃ দরবারী পোষাক সাদা চুরিদার পাজামা ও আচকান। প্রাবন্ধিক পরামর্শ দিয়েছেন যে ধুতি পাঞ্জাবী বা বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ভব্য পরিচ্ছেদ যা ব্যবহারে সুবিধাজনক তা দরবারী পোষাক হিসেবে গণ্য হতে পারে।

প্রাবন্ধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের জবড়জঙ্গ পোষাক থেকে শান্তিনিকেতনে উৎসবাদি উপলক্ষে ধুতি-পাঞ্জাবীর উপর বাসন্তী রঙের উত্তরীয় অধিক সুলভ ও শোভন বলেছেন। প্রাবন্ধিক কনভোকেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পোষাক প্রবর্তনের কথা বলেছেন।

রোদ থেকে মাথা রক্ষা করার প্রধান উপায় টুপি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্যে সোলা-হ্যাটের প্রচলন করার পরামর্শ লেখক দিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক নারীর পোষাকের ক্ষেত্রে সর্বকালে শাড়ির সৌন্দর্য অতুলনীয় বলেছেন। তবে শাড়ি-ব্লাউজ সুশোভন পরিচ্ছদ তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে শিক্ষা ও জীবিকার জন্য

সুবিধামত পোষাক আবশ্যকীয়।

''এখানে আবার রাজশেখরের নির্মোহ বৈজ্ঞানিক ঔদার্যও স্পষ্ট। পোষাক যে দেশের জলবায়ু ও উপলক্ষ্য অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তা তিনি জানেন, তবু অন্য সংস্কৃতির কাছ থেকে গ্রহণ করা পোষাক মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই। ফলে পাজামার প্রতি অনেকের (হয়তো কিছুটা সাম্প্রদায়িক) বিদ্বেষ থাকলেও, রাজশেখর বলে দেন ''তা নানা বিষয়ে ধুতির চাইতে শ্রেষ্ঠ।'' এমনকি কর্মক্ষেত্রে বাঙালী মেয়েরা যদি স্কার্টস বা স্ল্যাক্স পরে যায় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই।''[৭৭]

সংস্কারমুক্ত সুরচিবোধের সুস্থজীবনবোধের প্রকাশ আমাদের বিপন্ন সময় - বিজ্ঞাপনে নারীর স্থান, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন - এই বিভিন্ন দিকে পোষাক এক বিশেষ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

জীবিকার উপযুক্ত পোষাক - সেটা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই যেন কাজের সহায়ক হয় সেকথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। নারী-সৌন্দর্য যদিও শাড়িতে অতুলনীয় তবে জীবিকার জন্য পেণ্ট বা স্কার্ট পড়তেও লেখকের আপত্তি নেই। তাছাড়া জলবায়ু ও পোষাকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সবদিক বিবেচনা করে প্রাবন্ধিক পোষাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্তমানকালের অত্যাধুনিক মানসিকতার প্রকাশ দেখিয়েছেন।

অশ্লীল ও অনিষ্টকর (১৯৫৮)

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে সিনেমার প্রতি মানুষের আসক্তির চিত্রটি তুলে ধরেছেন। খবরের বিখ্যাত লেখকের গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে সিনেমাসুন্দরীদের চিত্র এমনকি পূজা-মণ্ডপেও হিন্দী ফিলম্ সংগীত শোনা যায়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সিনেমা শুধু চিত্তবিনোদন করে না অনেক ক্ষেত্রে চিত্তবিক্ষোভও করে থাকে। আপত্তিজনক ছবিও বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা হলেও এক্ষেত্রে সেনসর বোর্ড হল সর্ব্বোচ্চ অধিকারী। শুধু ভারতবর্ষ নয় বিলাতেও অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি দেখা যায়। প্রাবন্ধিক ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসের World Digest পত্রিকায় Sidney Moseley-প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন - ''By film by television, by picture in the Press, we stir sexual emotions which are already astir in the normal human being ....''[৭৮]

প্রাবন্ধিক বলেছেন পাশ্চাত্য দেশের ছবি বা বিজ্ঞাপন কেমন তা ঠিক না জানলেও যেসব পোষ্টার দেখা যায় তা থেকে তিনি বলেছেন ভারতীয় ছবি থেকে তা 'প্রগতিশীল' অর্থাৎ এদেশ থেকে উদার ও নির্লজ্জ। তবে সত্যিকারের ''অশ্লীলতার কোনও বহুসম্মত মানদণ্ড নেই।''[৭৯] সময় বা কাল ও দেশভেদে তা ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রাবন্ধিক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতার কথায় বলেছেন - ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ উপাদেয় গ্রন্থ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বা অনেক মনীষী এতে বিলাস বর্ণনায় কুরুচি পেয়েছেন। ভারতচন্দ্রের রচনা বা বাঙালী কাব্যে আদিরস প্রাবন্ধিক বলেছেন আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টিতে অশ্লীল।

অশ্লীলতার লক্ষণ বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যা কামের উদ্দীপক তা বোঝায়। ''সামাজিক প্রথার সঙ্গে শালীনতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে।''[৮০] উদাহরণরূপে প্রাবন্ধিক ভিক্টোরীয় যুগে ভদ্র নারীর অর্ধমুক্ত বক্ষ ফ্যাশন ছিল কিন্তু অনাবৃত ankle বা পায়ের গোছ অশ্লীল বা পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বর্তমানে ankle প্রদর্শন রুচিসম্মত হওয়ায় পুরুষের লোভও প্রায় লোপ পেয়েছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, অনাত্মীয় পুরুষকে ভদ্র নারীর মুখ দেখানো অশ্লীল তাই বোরখা বা ঘোমটার প্রচলন হয়েছিল কিন্তু ''লোকে বহুকাল থেকে যা অনাবৃত দেখে তা সম্বন্ধে দুষ্ট বা morbid কৌতুহল হয় না, যা অবৃত তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়।''[৮১] প্রাবন্ধিক বলেছেন, অশ্লীল বিষয়ের প্রভাব সকলের উপর সমান নয়। কোন কোন পুরুষ সুন্দরী নারীর চিত্র বা প্রতিমূর্তি দেখলেই বিকারগ্রস্থ হন, আবার এমন লোকও দেখা যায় যারা অশ্লীল দৃশ্য বা বর্ণনা শুনেও নির্বিকার থাকতে পারেন। তাছাড়া সামাজিক সংস্কারের জন্যও শ্লীল বিষয় অনেক সময় অশ্লীল হতে পারে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, রুচি ও শালীনতার ধারণা সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে বদলায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের দিয়ে নাচ ও অভিনয় করানোর জন্য অনেক নিন্দা শুনতে হয়েছিল কিন্তু তা স্বাভাবিক বিষয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভদ্রনারী সিনেমায় নেমে বহুজনপ্রিয়া ও রূপবিলাসিনী হবে এবং প্রচুর প্রতিপত্তিও পাবে তা পূর্বে কল্পনাতীত ছিল। প্রাবন্ধিকের ধারণা অচির ভবিষ্যতে বাঙালীর হোটেলে বা রেস্তোরাঁতে হয়ত মেয়েরা নাচবে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''স্বাধীনতা লাভের পর যেন পরিবর্তনের প্লাবন এসেছে।''[৮২] ভারতীয় লোক আগ্রহের সঙ্গে বিলাতি আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করছে। ''পাশ্চাত্য বীর্য উদ্যম কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ না পেলেও ক্ষতি নেই, পাশ্চাত্য রীতি নীতি ফ্যাশন ব্যসন যথাসাধ্য আত্মসাৎ করতেই হবে, তাই আমাদের পরম পুরুষার্থ।''[৮৩]

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, বিধানসভা অর্থাৎ এদেশের নিয়ন্তা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্ত তাই তিনি আশা করেন শিক্ষিত ভারতবাসীর রুচি অনুসারে শ্লীলতা অশ্লীলতা বা নিরাপত্তা ও অনিষ্টকারিতা বিচার করবেন এবং সেভাবেই সিনেমা ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত

হবে।

প্রাবন্ধিকের মতে, কোন সাহিত্যিকের ভাল মন্দ বিচার সমালোচকরা ধীরে-ধীরে করে থাকে কিন্তু সিনেমার নির্বাচনে সেনসর বোর্ড খুব বেশি সময় নিতে পারেন না। তবে এইক্ষেত্রে অতিমাত্রায় উদার না হওয়া উচিত। এবং সিনেমার মানসিক উত্তেজনায় যদি দৈহিক বিকারের সম্ভাবনা থাকে তবে সে ছবি বর্জন করা উচিত।

প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''আর্টের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে কিঞ্চিৎ কমকলার প্রয়োজন থাকতে পারে। সিনেমা আর সাহিত্যে তার প্রয়োগ যদি সংযত করা হয় তবে আর্ট আর সংস্কৃতি চর্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।''[৮৪]

অশ্লীল ও অনিষ্টকর প্রবন্ধে লেখক সিনেমার প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং এইক্ষেত্রে অশ্লীল বিষয়গুলিকে বর্জন করে। কামচেতনার সংযত প্রকাশের মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি কিভাবে মানুষের চিত্তবিনোদন করতে পারে সেই কথা বিশ্লেষিত করতে গিয়ে পাশ্চাত্য দেশে শ্লীলতার কথাও তুলে ধরেছেন। উদাহরণ দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে সমাজ ও সময়ের পার্থক্য শ্লীলতার মাত্রা নিরূপিত করে। সংস্কৃত সাহিত্য ধারা থেকে বর্তমান কালের সাহিত্যের চিহ্ন ধরে এই শ্লীলতার পার্থক্য লেখক যথোপযুক্ত ভাষার মোড়কে পরিবেশন করেছেন। এবং সর্বশেষে লেখক বলেছেন যে আর্টে কামকলার প্রয়োগ সংযতভাবে পরিবেশিত হলে আর্ট ও সংস্কৃতি চর্চা ভাল হবে।

সাহিত্য বিষয়ক

১) রস ও রুচি (১৯২৭)

২) সাহিত্য বিচার (১৯৩৪)

৩) সংকেতময় সাহিত্য (১৯৪৩)

৪) সাহিত্য সংস্কার (১৯৪৯)

৫) সাহিত্যিকের ব্রত (১৯৫১)

৬) নিসর্গচর্চা (১৯৫৪)

৭) ছোট গল্প বলতে কি বোঝায় (১৯৫৬)

৮) গল্পের বাজার (১৯৫৭)

৯) সাহিত্যের পরিধি (১৯৫৭)

১০) পরিপূর্ণ সাহিত্য (১৯৫৯)

১১) রচনা ও রচয়িতা (১৯৫৯)

১২) রবীন্দ্র কাব্য বিচার (১৯৬০)

রস ও রুচি (১৯২৭)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, প্রাচীন সাহিত্য ধারায় ঋগবেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বললেন - ''কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি''[৮৫] - অর্থাৎ প্রথম যা উদয় হয় তাই কাম। প্রাবন্ধিক বলছেন আলংকারিকরাও নবরসের মধ্যে প্রথমেই আদিরসকে স্থান দিলেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, এগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

লেখক তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, মনোবিদ্যার বৈঠকে রবীন্দ্র রচনার সাইকো অ্যানালিসিস-এ বক্তা রবীন্দ্র সাহিত্যের হাড় মাংস চিড়ে কবি প্রতিভার মূল উৎস দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটা অবান্তর বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে।

যা কিছু স্পৃহনীয় বরেণ্য এবং উপভোগ্য - এ সমস্ত কিছুর মূলে আছে হীন রিপু, ফ্রয়েডের দল যাকে 'লিবিডো' বলেছেন। এই লিবিডো বা লালসা, ''তার শতজিহ্বা শতদিকে লকলক করছে, সে দেবতার ভোগ শকুণির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটতে চায়, তার পাত্রাপাত্র কালাকাল জ্ঞান নেই।''[৮৬]

কাব্য সাহিত্যে চৌষটী-কলা ভক্তি প্রেম, স্নেহ সমস্তই কামজ আবার গীতায় আছে - 'কাম এষ, ক্রোধ এষ'। প্রাবন্ধিক ব্যঙ্গ করে বলেছেন ফ্রয়েডের শিষ্যরা গীতার একটা সরল ব্যাখ্যা লিখলে পারতেন।

প্রাবন্ধিকের মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায় - বৈদিককাল থেকে আরম্ভ করে ফ্রয়েডপন্থী পর্যন্ত কেউ একথা স্পষ্ট করেননি যে প্রথম কাম না ক্ষুধা ? প্রশ্ন থেকে যায় পাচনরসই কি অদিরস। কাম-কমপ্লেক্সের নব নব রূপ দেখা যায়, ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সের কি তেমন কোন ক্ষমতা নেই?

আধুনিক মনোজ্ঞগন বলেন, অতৃপ্তি বা নিগ্রহে কামের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে ভোজনেরও অতৃপ্তি আছে কিন্তু তাতে খুব একটা প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ ''উপবাসের চেয়ে বিরহের সৃষ্টিশক্তি বেশী''[৮৭] ন্যায্য অন্যায্য পবিত্র পাশবিক অস্বাভাবিক সমস্ত অতৃপ্তিই বিরহ।

সাহিত্যে ভোজনরসের প্রভাব নেই। এ সম্বন্ধে লেখক উদাহরণ ও দিয়েছেন - কালিদাসের যক্ষ বিরহী নয় উপবাসী ও বটে। সে অলকাপুরীর ভোগের বর্ণনা করেছে কিন্তু বাবুর্চীখানার কথা কিছু বলেনি। রবীন্দ্রনাথের গাজীপুরযাত্রী খুড়োমশাইও ষ্টীমারে কমলার রান্নার সুবাস পেয়ে ভবিষ্য ব্যঞ্জন পরম্পরার কল্পনা করে অনাথ মেয়ের স্নেহে বাধা পড়েছিলেন।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, মানবমনে প্রবাহিত যে কাম রস তার পরিবর্তনের ফলে আমরা প্রেম, ভক্তি, স্নেহ কলা কাব্য প্রভৃতি ভাল জিনিসও পেয়ে থাকি। রসগ্রাহীভদ্রজন ফুল, ফল চায় গাছের গোড়ায় কি সার আছে সাধারণতঃ তার খোঁজ করে না। কিন্তু ফুলে ফলে আমাদের তৃপ্তি হয় না, গাছের গোড়ার জীবনী রস ও অনেক সময় আমাদের আস্বাদ্য বলে আমরা কামনা করি। ''সামাজিক জীবনে যা ঘৃণ্য বা পীড়াদায়ক, এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হলে আমরা সমাদরে উপভোগ করি।''[৮৮] তা না হলে শোক, দুঃখ, নিষ্ঠুরতা, লালসা, ব্যাভিচার ইত্যাদির বর্ণনা কাব্য, গল্প বা চিত্রে দেখা যেত না।

প্রাবন্ধিকের মতে রসের মূল কথা হল - ''আমাদের বহু কামনা নানা কারণে অমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্বাসিত হয়েছে এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হযে হৃদয় ফুঁড়ে বার হয়েছে।''[৮৯] - বিভিন্ন ভাবনার এখানে চরিতার্থতা 'কাম'কে সাহিত্যে বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত করেছেন। কেউ বা ভদ্র সাজগোজের আড়ালে কামকে উপস্থাপিত করছেন আবার কেউ বা যেমন আছে তেমনি তাকে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন - লোলুপ রসলিপ্সুরা বলেছেন, - এই আসল আর্ট, অদিম ও চরম। সংযমীরা বলেছেন, এ আর্ট নয় কারণ আর্টে আবিলতা থাকতে পারে না। - এই দুই রসস্রষ্টা দলের মধ্যে মাত্রাভেদ বা সংযমের তারতম্য দেখা যায়। ক্ষমতাবান স্রষ্টার কাছে যে কোন চিত্র রসবস্তু। প্রাবন্ধিকের মতে, সুরুচি ও কুরুচি সীমা দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না, কারণ এক যুগে যা নিন্দনীয়, অপর যুগে তাই উত্তম আর্ট।

প্রাবন্ধিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই রীতিতে মানব মনের গতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, সৃষ্টির বীজ মানব মনে নিহিত তাই প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো' এবং ঋষিপ্রোক্ত - 'কাম'। কোনটি আর্ট এবং কোনটি আর্ট নয় - এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কোন

নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেনি। সুরুচি, কুরুচি, সুনীতি, দুর্নীতি বিবাদ কোন কালে শেষ হবে কি না, তাও এক প্রশ্নচিহ্ন।

রসকে সংজ্ঞার বাঁধনে বোঝান অসম্ভব, কারণ প্রাবন্ধিক বলেছেন অনুভববেদ্য। কোন সাহিত্য স্থায়ী হতে হলে তাতে বিষয়ের মাত্রাজ্ঞান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ তাছাড়া ভোক্তার রুচি ও কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে যে লেখকের সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

'রস ও রুচি' - সাহিত্যতত্ত্বে রস বস্তুটি মূলত কী? এটি এক বিশেষ আলোচ্য বিষয়, 'রস' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্‌বেদের ঋষি, বিভিন্ন আলংকারিক ও পাশ্চাত্য ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সবাই 'কাম' রসের প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার এও বলা হয়েছে যে ভক্তি, প্রেম, স্নেহ সমস্ত কিছুর মূলে আছে কাম। অর্থাৎ সাহিত্যে নবরসের মধ্যে কামরসের প্রাধান্য অনুভব করা যায়।

প্রাবন্ধিক আর এক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছেন যে, কাম না ক্ষুধা কোনটি সর্বপ্রথম ছিল। মানুষ বা জীব বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ খাদ্য। কিন্তু কামের যেমন ক্ষমতা ক্ষুধার তেমন কোন ক্ষমতা নেই। অতৃপ্তি বা বিরহ নিগ্রহ ইত্যাদিতে কামের বিভিন্ন রূপান্তর দেখা যায়। ভোজনের অতৃপ্তিতে সাহিত্যে তেমন কোন প্রভাব দেখা যায় না।

সমাজের বাধা যেখানে প্রবল মানুষের সেই বাধা অতিক্রম করার সেখানে প্রবণতা বেশি দেখা যায়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পাউরুটির লোভে কিছুদিন সনাতন সমাজ বর্জন, করেছিলেন, বর্তমানে সমাজে খাদ্যে বাধা নিষেধ তেমন প্রবল নয় তাই ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সের ফলে অঘটন ঘটার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। তবে সমাজে বিবাহ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বাধা নিষেধ থাকার জন্য সমাজ ও সাহিত্যে এই অঘটনের বিভিন্ন চিত্র আমরা দেখি।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, তাই মানব জীবনের শোক, দুঃখ, লালসা, নিষ্ঠুরতা, ব্যভিচার - ইত্যাদির বর্ণনা সাহিত্যে চিত্রিত হতে দেখা যায়। 'কাম' রসের প্রভাব সাহিত্যে বিশেষ ভাবে বর্তমান কোন সাহিত্যিক সরাসরি 'কাম' কে সাহিত্যে উপস্থাপিত করছেন আবার কেউ বা আবরণের আড়ালে। সাহিত্য তত্ত্বের প্রাচীনতম এবং গভীর বিষয় 'রস' নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঋগবেদ থেকে আরম্ভ করে পাশ্চাত্য ফ্রয়েড এবং আধুনিক দার্শনিক প্রজ্ঞা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সাহিত্যিকের রসবোধ এই তিনের সম্বন্বয়ে যথাযোগ্য লক্ষ্যভেদী শব্দ ব্যবহারে মানবের আবেগের যুক্তিসিদ্ধ উপস্থাপনা এই প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় গুণ।

মানবের চিরন্তন আবেগকে পক্ষপাত শূন্য, সূচীবায়ুগ্রস্থতাহীন মানসিকতায় বিশ্লেষণ করে সার্বজনীন ভিত্তির উপর তার মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহু চর্চিত বা বিতর্কিত বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করে রস ও রুচির যথাযোগ্য মিলনে কালজয়ী সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব, এই চিরন্তন কথাকে যথাযোগ্য ভাষা ও উপস্থাপন রীতির সৌকর্যে প্রাবন্ধিক পাঠকদেরকে চিরন্তন কথা আবার নতুন রসপাত্রে পান করিয়েছেন।

কামকে উপস্থাপিত করেছেন মাত্রাভেদ ও সংযমের তারতম্যে যদিও দুই দলের মধ্যে আছে তথাপি শ্লীল অশ্লীলের সীমারেখা দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। কারণ যুগের সঙ্গে শ্লীল অশ্লীলের পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্ষমতাবাণ স্রষ্টার লেখনীতে সবই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

দার্শনিক প্রজ্ঞা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সাহিত্যিকের রসবোধ এই তিনের সম্বন্বয়ে যথাযোগ্য লক্ষ্যভেদী শব্দ ব্যবহারে মানবের চিরন্তন আবেগের যুক্তিসিদ্ধ উপস্থাপনা এই প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় গুণ।

সাহিত্যবিচার (১৯৩৪)

মানুষের মনকে প্রাবন্ধিক আশ্চর্য যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুখ, দুঃখ বিভিন্ন মনোভাব আমরা বুঝলেও তার নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে কোন গুণ থাকলে সাধারণ মানুষ খুশী হবে তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তাছাড়া সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এই বিচারপদ্ধতি কিরূপ হবে, তাও বোঝা কঠিন।

উদাহরণরূপে প্রাবন্ধিক চা-বাগানের চা-এর দাম নির্ণয়ের পন্থাটি উল্লেখ করেছেন। চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপার বিশেষ কোন যন্ত্র নেই, তাই বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হয় তাঁরও সম্বল জিব আর নাক। এবং এরই সাহায্যে তিনি তার দাম স্থির করেন। টি-টেসটারের লক্ষণ-স্বাদ গন্ধের সূক্ষ্মবোধ এবং অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা কোন সাহিত্যকে বৈদগ্ধ্যের মাপকাঠিতে দাঁড় করাতে পারে - কিন্তু এই সাহিত্য বিচারের পদ্ধতির কথা জিজ্ঞেস করলে তার সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাই রসবিচারের মাপকাঠি বলতে নির্দিষ্ট কিছু নেই।

সাহিত্য রসে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় দেখা যায়, তবে সংগীত রস মনে হয় কিছুটা সরল শুধু একটি স্বরের সঙ্গে বিশেষ কোন স্বরের মিলন মিষ্ট বা কটু স্বর শোনা যায়। শ্রবণেন্দিয়ের এই রহস্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্ব জানা যায় নাই, তাই সংগীতবিদ্যা কলা বা আর্ট তা বিজ্ঞান নয়।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লেখকের মতে সাধারণতঃ স্পষ্ট নয়, তাই বিভিন্নজন ভিন্ন মত দিয়ে থাকেন - কারো মতে art for art's sake, মানুষের কল্যাণ সাহিত্যে কাম্য, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মিলন সাধন। - এক-কথায় বলা যায় সাহিত্য রসে মানুষ

আনন্দ পায়। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু, অম্ল, মিষ্ট, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, ঝাল, টক প্রভৃতি উপাদান পরিমাণ মত মিশ্রণ করে উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন তেমনি প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা বিভিন্ন রস ভাবের উপাদানকে তাঁর সৃষ্ট শক্তির সাহায্যে প্রকৃত সাহিত্য রচনা করেন। প্রাবন্ধিকের মতে, অসংখ্য ব্যক্তির রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত যিনি করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক এবং যে এই রচনার প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি করে সাধারণকে সেদিকে আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি।

লেখক উদাহরণ দিয়েছেন, তামাক একটা বিষ, তাতে স্বাস্থ্যহানি হলেও লোকে তার থেকে বেশি মজা পায়। পাশ্চাত্য দেশে মদ সম্বন্ধে এই ধারণা দেখা যায়, তবে বেশি স্বাস্থ্যহানি হলে মজা নষ্ট হয় ও রসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সাহিত্যিক মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের দিকে দৃষ্টি রেখেই রস পরিবেশন করেন। যদিও এই 'রস' ব্যাপারটা অপরকে যেমন বোঝান যায় না তেমনি নিজেও তাকে এক সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা কঠিন। প্রাবন্ধিকের মতে 'রস' অনুভবের বিষয়।

সাহিত্য বিচারের মূল্যবান উপাদান মানবমন - মনের ভিন্ন অনুভূতির মাধ্যমে সাহিত্যের রসানুভূতি হয়। মানবের জটিল মনস্তত্ত্বই সাহিত্য নিরিখের মাধ্যম। বিভিন্ন মানুষের রুচি, মূল্যবোধ, ভাললাগা, মন্দলাগা, ন্যায়, অন্যায় পরিবেশ ব্যতিরেকে ভিন্ন হতে পারে - এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে - 'ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ।'

সংগীত রসের ক্ষেত্রে একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ই উপাদান। শুধুমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা শ্রবণ শক্তির মাধ্যমে আমরা সংগীত রস লাভ করতে পারি। সংগীত ও সাহিত্য দুটি আর্ট হলেও একটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রসলাভ করি তাই দেশ কাল ভাষা ব্যতিরেকে সংগীত রসের অনুভূতি সমান। কিন্তু সাহিত্যকে হৃদয়রসে আপ্লুত করে পান করা হয় - তাই এতে

বৈচিত্র্য দেখা যায়।

'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধে দেখা যায়, মানবমনের বিচিত্রমুখী গতি - প্রকৃতি বিচার করার বিশেষ কোন যন্ত্র নেই। ঠিক তেমনি সাহিত্য বিচারের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। সাহিত্য রসের সঙ্গে প্রাবন্ধিক সংগীত রসের আলোচনায় দেখিয়েছেন, যেহেতু সংগীত উপভোগে কান একটি মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাই স্বরের কটু ও মিষ্টতা সমান শোনা যায়। কিন্তু এই স্বরের ভিন্নতা শোনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তাই সংগীতকে আর্টের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সাহিত্য রসের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায় - art for art sake, মানুষের কল্যাণ সাহিত্যে কাম্য, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন। দক্ষ পাচক যেমন বিভিন্ন স্বাদকে মিলিয়ে এক সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তেমনি সাহিত্যিক মানবজীবনের ভাল, মন্দ, শ্লীল, অশ্লীল, সুখ, দুঃখ - বিভিন্ন উপকরণ যথাযথ মিশ্রিত করে এক উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করেন, বিশেষ সাহিত্যের প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি করে সাধারণকে সেই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন, তিনিই সত্যিকারের সাহিত্য সমালোচক। এবং প্রাবন্ধিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সাহিত্য রসকে বিশেষ কোন সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে 'কেউ বলছেন art for art's sake করো মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কল্যাণ বা মিলন ভিন্নভাবের এই সর্বজনস্বীকৃতমতকে প্রাবন্ধিক যথাযথ ভাষার মোড়কে সাহিত্য রসে আপ্লুত করে পরিবেশন করেছেন।

সংকেতময় সাহিত্য (১৯৪৩)

প্রাবন্ধিক মানব স্বভাবের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরে বলেছেন যে, সমকালীন আবিষ্কারের মূল্য আমরা সহজে ভুলি না। পুরাতন আবিষ্কার বা প্রাচীন মানবের চেষ্টায় যা হয়েছে, তাতে আমাদের বিস্ময় নেই, যেমন - আগুন, কৃষি, বয়ন শিল্প। যার অভাবে আধুনিক জীবন যাত্রা সম্পূর্ণ অসম্ভব হত। প্রাবন্ধিকের মতে, প্রাচীনকালে এমন একটি বিষয় উদ্ভাবন হয়েছিল যার জন্য মানুষের বুদ্ধি ও চিত্তের উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে একদিন হয়ত সমগ্র মানবজাতি একসত্তায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল - এই অসীম শক্তিশালী পরম সহায়ক বিষয়ের নাম সাহিত্য।

প্রাবন্ধিক বলছেন, Literature শব্দের মৌলিক অর্থ লিখিত বিষয়। 'সাহিত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ হল - সাহিত্যের ভাব বা সম্মেলন, যার ফলে বহু মানব একভাবে ভাবিত হয়। আদিম যুগে ভাব প্রকাশের উপায় ছিল অঙ্গভঙ্গী ও শব্দভঙ্গী পরবর্তিকালে এল বাক্য। প্রাবন্ধিকের মতে ''শ্রুতি আর স্মৃতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য।''[৯০]

লিপি উদ্ভবের বিষয়টির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল স্থূল - নিজের জিনিষ চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা, দান-বিক্রয়াদির দলিল করা ইত্যাদি তাছাড়া চিঠি রাজ আজ্ঞা ঘোষণাপত্র, অনুশাসনলিপি ও প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে মানব সমাজে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য লিপিবদ্ধ এবং মুদ্রিত হওয়ায় তা জনসমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হল। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে বিদ্যা গুরুমুখে শুনে শিষ্যরা বার-বার আবৃত্তি করে মুখস্ত করে তা স্মৃতিপটে নিবদ্ধ করত। লেখা অক্ষয়, রচয়িতার মৃত্যু হলেও তাঁর লেখা জীবিত থাকে ও তার প্রভাব সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, যখন আমরা উত্তম সাহিত্য পড়ি, তখন সেই লেখকের ভাব,

রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি, জ্ঞান আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। শিশুকালে প্রথম অক্ষর শিখতে কত না প্রচেষ্টা করতে হয়েছে যা কথা বলতে বা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট করতে হয় নি। শিশুর কাছে অক্ষর বিস্বাদ, পরবর্তীকালে অর্থবোধ আনন্দ দেয় যেমন, ''জল পড়ে পাতা নড়ে।''[৯১] সাহিত্যের এই প্রথম আস্বাদ সকল শিশুই পায়। উদাহরণ স্বরূপ লেখক বলেছেন, - পাখি তার বাচ্চাকে উড়তে শিখিয়ে আকাশচারী করে তেমনি, ''মানুষও সেই রকমে তার সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচারী অর্থাৎ বিদ্যার্জনের যোগ্য করবার চেষ্টা করে।''[৯২] পরে লেখা পড়া হাঁটাচলার মত এই বিষয়টি স্বভাবে পরিণত হয়। লেখকের আক্ষেপ হয় যে, এমন হতভাগ্যও আছে যে সামান্য মাত্র অক্ষর পরিচয়েরও সুযোগ জীবনে পায় না।

প্রাবন্ধিক বলছেন, স্মরণ ও বিচারশক্তির সাহায্য মানুষ নানারূপ প্রতীক ও সংকেতের উদ্ভাবন করে চলেছে। বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই সংকেত অপরিহার্য। জলের সংকেত H_2O দেখলে কখনই বৃষ্টিধারা, পানীয়জল, মহাসাগর কিছুর কথা মনে হয় না, গানের স্বরলিপি আমাদের গান শোনার যে অনুভূতি তা কখনই অনুভব করাতে পারে না।

সত্যমূলক ও কাল্পনিক ঘটনা প্রতিরূপিত করতে লেখক বলেছেন - নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ। এরপর মুখর চলচ্চিত্র কিন্তু ''লিখিত সাহিত্যই একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কোনও আড়ম্বরের দরকার হয় না, নূতন সংকেতও অভ্যাস করতে হয়না।''[৯৩]

সাহিত্যের বিচিত্র ও জটিল বিষয় প্রত্যক্ষ করা লেখকের মতে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মানুষ যদি অল্পাধিক বিদ্যা না শেখে তবে পঙ্গু হয়ে থাকবে। হিতোপ দেশে আছে -

''অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।

সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।।"[৯৪]

- অর্থাৎ অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, সকলের লোচন স্বরূপ শাস্ত্র যার নেই সে অন্ধ। তাই শাস্ত্র বা বিদ্যা শেখার প্রবল প্রয়োজন থেকে সংকেতময় লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। ইন্দ্রিয় ও মনোগ্রাহ্য বিষয় চিরস্থায়ী করার জন্য এই সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভার।

প্রাবন্ধিক বলছেন, যে ভাষাকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সেই ভাষা সংকেতের শব্দাত্মক ও বাক্যাত্মক সমষ্টিমাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রয়োজনে শব্দ ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। ভারতীয় আলংকারিক শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা তিনি বলেছেন - অভিধা লক্ষণা, ব্যঞ্জনা। প্রথমটি আভিধানিক অর্থ, অপর দুটি বিষয় অনুসারে গৌণ অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের যেমন ত্রিশক্তি তেমনি বাক্যে উপমা রূপক বিভিন্ন অলংকার দেখা যায়। সাহিত্যের বিষয়ভেদে শব্দ ও বাক্যের অভিপ্রায় এবং প্রকাশ শক্তি ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ লেখক দেখিয়েছেন ''হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড"[৯৫] - এই ভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্তু ভূগোলের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করা যায় না।

'সংকেতময় সাহিত্য' প্রবন্ধটি আলোচনা করতে গিয়ে লেখক প্রথমে সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন যে সমগ্র মানবজাতিকে একসত্তায় পরিণত করতে যে অসীম শক্তিশালী বস্তু পরম সহায় তাই হল সাহিত্য।

লিপি উদ্ভবের উদ্দেশ্য যদিও স্থূল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে গুরুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিদ্যা বা সাহিত্য মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল তাই সাহিত্যকে স্থায়ীত্ব দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হল, লিপির মাধ্যমে আমরা এই বিদ্যালাভে যুগ যুগান্তরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেলাম।

বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের Simbolic চিহ্ন বা লিপি কখনই সাহিত্যের, রস পরিবেশন করতে পারে না। নাটক, চলচিত্র সত্য বা কাল্পনিক ঘটনা প্রতিরূপিত করা যায় কিন্তু কোন বাহ্যাড়ম্বর ছাড়া আমরা সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই সমস্ত রস উপভোগ করতে পারি। ইন্দ্রিয় মনগ্রাহ্য বিষয় চিরস্থায়ী করার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য। শুধু বিষয় নয় ভাষায় মুন্সীয়ানার সাহায্যে সেই বিষয় সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। ভারতীয় অলংকারের ত্রিবিধ শক্তির মাধ্যমেই বিষয়ভিত্তিক ভাষা ব্যবহার রীতি দেখা যায়।

লেখক বলেছেন যে মানবদেহ বা যন্ত্রের গঠনের ক্ষেত্রে মাপ মূলানুযায়ী হয়। চিত্রকর অঙ্গের উচ্চতা নিম্নতা, নিকটত্ব, দূরত্ব বোঝানোর জন্য কখনও রেখা বিকৃত করেন আবার কখনও মসীলেপের তারতম্য করে বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তোলেন। লেখকও বিষয় ও ভাব অনুসারে ভাষাকে ব্যবহার করে থাকেন। নিপুণ রচয়িতা শব্দবৃত্তি এবং নানা অলংকার প্রয়োগ করে ভাষার ইন্দ্রজাল তৈরী করে অতীন্দ্রিয় বিষয়ও পাঠকের বোধগম্য করে তুলেন।

অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে মানুষ সাহিত্য জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করে। লেখক আক্ষেপ করছেন যে অনেক দুর্ভাগা আজও বর্তমান যারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার মাত্র 74.04%।

সংকেতময় সাহিত্য - সংকেত বিজ্ঞান ও গানের স্বরলিপিতেও রয়েছে। কিন্তু তাতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির কোন ব্যাপার থাকে না। 'কিন্তু সাহিত্যের ভাষা যে সংকেত তা বিজ্ঞান ইত্যাদির মতো সংকীর্ণ বা নির্দিষ্ট নয়। শব্দের যেমন অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই তিন রকম শক্তি আছে, তেমনি বাক্যের আছে উপমা, রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার। সাহিত্যের

ভাষার এই বিচিত্র শক্তি ধরা পড়ে। এই জাতীয় সংকেত যদি একটু বেশি অভিনব হয় তখন তা বুঝতে সময় লাগে কিংবা বোঝাই যায় না। সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় এই রকম অপরিচিত সংকেত সমস্যার সৃষ্টি করে। সংকেতের নির্দিষ্ট অর্থ অতিক্রম করলেই তা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।"[৯৬]

সাহিত্য সংস্কার (১৯৪৯)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সবদিকে শুভলক্ষণ হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ শেষ হয়েছে, স্টেটসম্যান বর্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জন তাছাড়া রিফর্ম কমিশন ও বয়কট হবে। কিন্তু -খুড়ার গঙ্গাযাত্রার কাজ বাকী, কিন্তু উপযোগী খুড়া পাওয়া সহজ নয়। প্রাবন্ধিকের মতে সাহিত্যে একটা পরিবর্তনের সময় এসেছে, লেখকের চরিত্র শোধন নয় তাদের সৃষ্ট নায়ক - নায়িকার চরিত্র শোধনের ব্যাপারটা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়।

লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন, গীতায় আছে, কি কর্ম কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে যে অনর্থ ঘটেছে তার প্রতিকার প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক এই বিষয়ে আমাদের প্রথম কর্তব্য - বড় বড় লেখকরা যা লিখেছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্তব্য - ভবিষ্য লেখকদের জন্য একটা আদর্শ তৈরী করা।

লেখকদের মধ্যে যারা সম্রাট, প্রাবন্ধিকের মতে তাঁদের লেখা আবশ্যকমত সংস্কার করা অবশ্য কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা কোন গানের সুরেও নাকি হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। যদি এই বিষয়টি সত্যি হয় তবে তা প্রাবন্ধিক বলেছেন অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। স্টিভেনশনের তৈরী রেলগাড়ির চিমনি চার হাত লম্বা ছিল, এবং গাড়িটি গজেন্দ্রগমনে

ঘণ্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলত। বর্তমানে সেই রেলগাড়ির ইঞ্জিন অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু স্টিভেনশনের মর্যাদা ম্লান হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সুর পরিবর্তিত হয়ে যদি বাগেশ্রী - চৌতালে পরিণত হয় তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুন্ন হওয়ার কিছু নেই, ''কারণ ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম''।[৯৭]

প্রাবন্ধিকের মত, দক্ষ ব্যক্তির হাতে গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশবাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর যদি বিয়ে দেওয়া হয়, তবে মন্দ হয় না। নরেশচন্দ্রের কমলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর শুভবিবাহ যদি সংঘটিত হয় এবং এজন্য যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চাকারভর্তি সাহেব সঙ্গত রচনা করেন - তবে একটি সামাজিক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। এভাবে প্রবীণ বড় বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করে নির্দোষ চিরস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যেতে পারে বলে প্রাবন্ধিক পরামর্শ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নির্ণয় করা যাতে আর্ট ও সমাজ দুই বজায় থাকে।

লেখক আর্ট-এর কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রসবস্তু এবং তা ভদ্রজনের মুখরোচক করে পরিবেশন করাই আর্ট-কিন্তু এক বস্তু সকলের ভাল না লাগতে পারে তাই ''আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ ব্যক্তিগত''[৯৮]। তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন একই জিনিস অনেকের ভাল লাগলেও অনেক সময় মাত্রার তারতম্য নিয়ে বিবাদ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ প্রাবন্ধিক, পেঁয়াজ ও দুধ-কে নিয়েছেন, দুধ উপাদেয়, বলবৃদ্ধিকারক। পেঁয়াজও অনেকের রুচিকর তবে দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুটিই অপরিহার্য রসবস্তু। তাই সমাজের মতে দুধ যত বেশি খাবে তত বলবৃদ্ধি হবে কিন্তু পেঁয়াজ বেশি মাত্রায় বিকট - তাই দুধ খোরকে সাত্ত্বিক এবং পেঁয়াজ খোরকে নেড়ে বলা হয়।

তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন এটি অন্ধ সমাজের কথা, অন্তরের কথা নয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রীতির কথা শুনতে ভাল লাগে কিন্তু উপযুক্ত অনুপানের সঙ্গে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি - ব্যভিচার, নরমাংস, নারীমাংস ইত্যাদিও কম উপভোগ্য নয়।

প্রথম কর্তব্যের উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' থেকে দু-একটি চরিত্র নিয়ে সেগুলিকে আধুনিক আর্টের দৃষ্টিতে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। শৈবলিনী চরিত্র মোটামোটি মন্দ হয়নি তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন প্রায়শ্চিত্ত একটু বেশী হয়ে হয়ে গেছে তাই তিনি প্রতাপ চরিত্রকে সংশোধিত করে এভাবে পরিবর্তন করেছেন যে - প্রতাপ রায় মরে নি, ঘা শুকিয়ে গেলে সুস্থ হয়ে এসে সে, চন্দ্রশেখরকে ডেকে বলছে শৈবলিনীকে ডেকে দিতে কারণ আজ সে তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। চন্দ্রশেখর বলছে, সে কূলবধূ। প্রতাপের উত্তর, তোকি খাঁ প্রস্তুত আজই শৈবালিনীকে মুসলমান বানিয়ে দিলে সে চন্দ্রশেখরকে তালাক দিয়ে প্রতাপকে বিয়ে করবে তবে জাত যাওয়ার ভয় নেই কারণ কাল রামানন্দ স্বামীকে ধরে দুজন আবার শুদ্ধ হয়ে যাবে। চন্দ্রশেখরের প্রশ্ন - তুমি কি জাল প্রতাপ? প্রতাপ বজ্রনিনাদে বলল, যে শৈবলিনীর অন্তরের কথা গণনা করে দেখে না তাকে কেন সে বিয়ে করেছিল। চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে জানাল যে স্ত্রী-চরিত্র গণনা করে জানা যায় না, তবে সে সুখে ঘরকন্না করছে তাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই। প্রতাপ উন্মত্তের মত হেসে বলল - অন্তরে শৈবলিনী তারই, তাকে চন্দ্রশেখর কোন অধিকারে আটকে রাখবে। প্রতাপ কিছুতেই মানতে রাজী না হওয়ায় চন্দ্রশেখর শেষ পর্যন্ত ভৃত্য রামচরণকে ডেকে ছড়ি আনতে বললেন বাঁশের লাঠি নয়। প্রতাপ জিজ্ঞেস করল, ছড়ি দিয়ে কি হবে? তখন ভটচায বললেন যে প্রতাপকে দু'ঘা বেত লাগাবেন। প্রতাপ লাফিয়ে গালাগাল দিতে আরম্ভ করল। ভটচায বললেন রামচরণকে এবার লাঠি

আনতে, তা শুনে প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করল। প্রাবন্ধিক উপসংহারে বললেন', ''আর্ট ও সমাজধর্ম দুইই বজায় থাকল, অথচ লাঠি ভাঙিল না।''[৯৯]

ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তিকালে, দেশ, সমাজ, পত্রিকা প্রভৃতিতে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেই সূত্রে প্রাবন্ধিকের মতে সাহিত্যে পরিবর্তন করে একটা আদর্শ তৈরী করা উচিত, এক্ষেত্রে তিনি প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি পরিবর্তন করে আধুনিক বা বর্তমান সময়োগযোগী করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ পরিবর্তনে সৃষ্টিকর্তার ঐতিহ্য ম্লান হয় না উদাহরণরূপে ষ্টিভেনশনের রেলগাড়ি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন।

সমাজের ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, আনন্দ-দুঃখ-সবই সাহিত্যে সমানভাবে গ্রহনীয় অবশ্যই যথোপযুক্ত পরিমাণের মিশ্রণে। বিভিন্ন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যে চরিত্র ও বিষয়গুলিকে মিলিয়ে পূর্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যারও সমাধান করার পরামর্শ প্রাবন্ধিক দিয়েছেন।

সাহিত্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে স্বচ্ছ ভাষায় লেখক পরিবেশন করেছেন।

সাহিত্যিকের ব্রত (১৯৫১)

সাহিত্যিকের ব্রত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলছেন, স্থূল অর্থে সাহিত্যে একের চিন্তা অনেককে জানানো হয়। বিষয়ানুসারে প্রাবন্ধিক সাহিত্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন -

প্রথম শ্রেণী - তথ্যমূলক, স্থান, কাল, ঘটনা, পদার্থের বিবরণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত - এর মুখ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যার আলোচনা।

দ্বিতীয় শ্রেণী - প্রচারমূলক, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির মতামত ও পণ্যদ্রব্যের মহিমা খ্যাপন।

তৃতীয় শ্রেণী - ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, উপজীব্য অসংখ্য, সাধনের উপায় ও ভিন্ন ভিন্ন - মূল উদ্দেশ্য রসোৎপাদন। এই শ্রেণীকে প্রাবন্ধিক 'ললিত সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছেন।

কবি, নাট্যকার, গল্প লেখক, শিশুসাহিত্যিক, ইতিহাস লেখক ইত্যাদি রচনার বিষয় বা প্রকৃতি অনুসারে লেখক বলেছেন রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হত। জাতি বা জীবিকার পরিচয়ে সাহিত্যিকদের চিহ্নিত করার রীতি বর্তমানে নেই। ললিত সাহিত্যিকের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকতে পারে কিন্তু রসবিচারে এগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বর্তমানে ললিত সাহিত্যের উপজীব্য অনেক বিষয় - স্বদেশী, রাজদ্রোহ, অসহযোগ, আগষ্ট-বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগের প্রভাব, বাস্তুত্যাগীর দুর্দশা, দেশব্যাপী অসাধুতা-সমস্ত কাব্য, গল্প, প্রবন্ধে স্থান পয়েছে। সহৃদয় লেখক নরনারীর সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছেন, অন্যায়ে ক্ষুদ্ধ, নির্যাতনে কাতর হয়েছেন - বিভিন্ন ঘটনা থেকে বীর করুণ বীভৎস ও ভয়ানক রস লেখকের উপলদ্ধিকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন।

এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহিত্য সংগঠন - উদাহরণ স্বরূপ ফ্যাসিশ্ট বিরোধী লেখক সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ, কমিউনিষ্ট লেখক সংঘ ইত্যাদি।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, কাব্য, নাটক, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যকে মাধ্যম করে মত প্রচারের রীতি নতুন নয়। প্রাচীন কাব্যে দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে দেখা যায়। নীলদর্পণ,

টমকাকার কুটীর, রাইডার হ্যাগার্ড বসন্তের টীকা না নেওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে সরকারের নির্দেশে একটি উপন্যাসে দেখিয়েছেন, যৌন ব্যাধি নিয়ে এমিল ব্রিত্ত নাটক লিখেছেন - এগুলি ললিত সাহিত্য হলেও প্রচার গ্রন্থ। মূলতঃ, লেখক বা অলেখক সবাই সমাজ ও রাজনীতিতে কোন না কোন গোষ্ঠীর অঙ্গ এবং এই অধিকার সকলের আছে। তবে বিশেষ সংঘটনের অঙ্গীভূত লেখককে একটু সন্দেহের চোখে দেখা হয় কারণ অনেকের মতে এরা সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ দৃষ্টি হারিয়েছেন।

রাজনীতির নাম নিয়ে সাহিত্য-সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক বলেছেন, নিজ নিজ রচনার মাধ্যমে দলীয় মত প্রচার ও বিপক্ষের মত খণ্ডন। দলবদ্ধ না হলেও এ কাজ হত কিন্তু সংঘের অনুশাসনে একনিষ্ঠ সমক্রিয়তা আসে। কিন্তু এতে সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের গন্ধ পাওয়া যায় এবং লেখকরাও স্বাধীনতা হারান। এছাড়া স্বতন্ত্র লেখকের রচনায় ললিত সাহিত্যের আবেদন বেশি পাওয়া যায়। কালোবাজার, প্রতারণা, অমানুষিক স্বার্থপরতা তাছাড়া বিভিন্ন পাপ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকল সাহিত্যিকই চেষ্টা করতে পারেন।

পূর্বে সকল দোষের মূল ছিল পরাধীনতা, বর্তমানে স্বাধীন ভারতে এই দোষ বর্তমান, তাছাড়া আরও নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই দোষবৃদ্ধির কারণ প্রাবন্ধিক বলেছেন - রাষ্ট্রশাসনে অভিজ্ঞতার অভাব - এর কারণ হল যুদ্ধের জন্য জগৎব্যাপী বিপর্যয়। তাছাড়া আমাদের ধর্মবোধ ও সামাজিক কর্তব্যবোধ ক্ষীণ এবং যুদ্ধের ধাক্কায় যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই অনভ্যস্ত প্রভুশক্তি নব ব্যবস্থার সুযোগে নিরঙ্কুশ স্বার্থসর্বস্ব হয়েছে, তাছাড়া অভাব ও অপরের স্বার্থন্বতা দেখে অনেকে অসাধু হয়েছেন।

নিত্যকার অন্যায় থেকে প্রতিরোধের প্রয়োজন রাজনীতিক বিবাদের উপরে। রাজনীতিতে এক দলের বদলে অপর দল এলেই যে এই সমস্যার সু-সমাধান হবে এরূপ

চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রাবন্ধিকের মতে, দোষ আমাদের প্রকৃতিগত এর প্রতিকারের উপায় আমাদের হাতে, সরকারের তা দূর করার শক্তি নেই।

সমাজ হিতকর বিধিই ধর্ম, ধর্মপালন অর্থাৎ সামাজিক কর্তব্যপালন। প্রাবন্ধিকের মতে, ধর্মবোধের অভাবে সমাজ ব্যধিগ্রস্থ হয়েছে -। সমাজকে রক্ষা করতে হলে নিজেদের আত্মরক্ষা করার কথা চিন্তা করতে হবে - কারণ আচরণের মাধ্যমেই অপবাদ দূর করা যায়। এবং এই দায়িত্ব ভালভাবে পালন করার শক্তি একমাত্র সাহিত্যিকদের আছে - তাই একাজে লেখনী ধরলে এর থেকে বড় ব্রত সাহিত্যিকদের আর নেই। সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টাই মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত করতে পারে। যেমন - হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো, দীনবন্ধু মিত্র, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, প্রথম নাথ বিশী, কবিশেখর কালিদাস রায় প্রভৃতি শক্তিশালী সাহিত্যিকরাই জাতির চরিত্র শোধন করতে পারেন।

সাহিত্যিকের ব্রত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য এবং সাহিত্যের বিভাগ অনুসারে তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন - তথ্যমূলক, প্রচারমূলক ও ভাবমূলক। ভাবমূলক বিভাগের ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং এর মূল উদ্দেশ্য রসোৎপাদন। এই শ্রেণীকে লেখক 'ললিত সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছেন। জাতি বা জীবকানুসারে লেখককে চিহ্নিত করা হয় না, যিনি সাহিত্যিক - শুধুমাত্র লেখনীর প্রকৃতি বা বিষয়ের ভিত্তিতে তাকে - কবি, নাট্যকার, শিশুসাহিত্যিক, উপন্যাসিক, ইতিহাস লেখক ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

ব্যাক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সেজন্য মনে যে বিভিন্ন রসের উদ্ভব হয়েছে এ সমস্ত কিছুকে জড়িত করে সাহিত্যিক যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিছু সৃষ্টি করেন তখনই তা সত্যিকারের সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করে। - প্রাবন্ধিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সাহিত্য সৃষ্টি করাকে 'সাহিত্যিকের ব্রত' বলে উল্লেখ করেছেন।

সাহিত্যিকের ব্রত'তে -

''সংকীর্ণ দৃষ্টি ছেড়ে স্থায়ী স্বার্থগুলির প্রতি নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।''[১০০]

প্রাবন্ধিক সহজ ভাষায় সাহিত্য শব্দের বিশ্লেষণ করে কোন রাজনৈতিক বা সংঘের চাপ বা আদর্শের মধ্যে নিরপেক্ষ সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় তাই সহজ ভাষায় নিরপেক্ষ দৃষ্টি যাতে সাহিত্যিকরা বজায় রাখেন সেকথা পরিমিত শব্দে ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে সরসভাবে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন।

নিসর্গচর্চা (১৯৫৪)

কালিদাস বাঙালী হলে সম্ভবতঃ মেঘদূতের পূর্বমেঘ লিখতেন না বা খুব সংক্ষেপ রচনা করতেন, কিন্তু উত্তরমেঘ সবিস্তারে রচনা করে তাতে 'মনস্তত্ব' বিস্তারভাবে জুড়ে দিতেন। প্রাচীন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য লেখকের মত নিসর্গপ্রীতি বাঙালী সাহিত্যকদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না।

কলকাতা ইট কাঠ লোহা কংক্রীটের শহর - সেখানে বর্ষাকালে কলকাতার উপকণ্ঠে লোক-সমাগম এবং অষ্টপ্রহরব্যাপী মকমক আলাপের মনোজ্ঞ বিবরণ বাঙালীদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না বরংচ ইংরেজ সম্পাদিত ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় তা দেখা যায়।

দেশী সংবাদপত্রে বাংলাদেশের সাপ, ব্যাং, শেয়াল, পোকামাকড় প্রভৃতি রসের সঞ্চার করে না অথচ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং পাশ্চাত্য লেখকদের লেখনীতে এদের সমাদর দেখা যায়। প্রতিদিন বিকালে মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়, চৈত্র বৈশাখ মাসে কাক শালিক পাখি বাসা বাঁধে, বর্ষা ও শীতের শেষে প্রজাপতি আসে আমরা বাঙালীরা তাদের খুব একটা গ্রাহ্য করি না। ইংরেজরা আবার প্রকৃতির এই ছোট ছোট

বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেন, উদাহরণস্বরূপ এক শৌখিন ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির বাগানে সাইন বোর্ডে লিখেছিলেন - ''Butterflies are welcome বাঙালী এমন ছেলেমানুষী রসিকতা করে না।''[১০১]

অনেক বৎসর পূর্বে বাংলা সংবাদপত্রে একজন অনুযোগ করেছিলেন দেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন, কিন্তু কবি বলেছেন -

''হৃদয় আমার নাচে রে, আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।''[১০২] কবি এর সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন - জগদ্ব্যাপী অশান্তির জন্য যদিও আমরা উদ্‌বিগ্ন এখন শুধু দেশ-বিদেশের রাজনীতিক সংবাদ, পুলিশের গুলিতে কজন মরল, রেশনের চাল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংবাদ জরুরী তথাপি দেখা যায় কুৎসিত মকদ্দমার বিবরণ, সাপের দুই পা, ছাগলীর গর্ভে মর্কটের জন্ম ইত্যাদি বিষয়ও পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে। গাছের উপর প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনের ছাপ ফেলে যায়, তা বাঙালীর কাছে উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের গল্প লেখক মিষ্টার বসু মিসেস চ্যাটার্জি বা কলেজের ছেলেমেয়ের প্রেমলীলা, বিভিন্ন বিপ্লবীদের গল্প কিন্তু নিসর্গবর্ণনার স্থান খুব একটা হয় না।

তবে ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, যেমন কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ - এরাঁও নিসর্গচর্চা করেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতি বন্দ্যো বনফুল তারাশঙ্কর বিভূতি মুখো প্রভৃতি কয়েক জন লেখক তাঁদের গল্পে মানুষ-মানুষীর সঙ্গে বৃক্ষ লতা ইতর প্রাণী নদী প্রান্তরকে ও সাদরে স্থান দিয়েছেন। বনফুলের 'ডানা' গল্পে পক্ষি ও নরনারীচরিত সমানভাবে দেখা যায়। তবে ইংরেজ ও প্রাচীন সংস্কৃত লেখকের তুলনায় আধুনিক লেখক নিসর্গচর্চায় বিমুখ।

উপনিষদের ঋষি নিসর্গে ব্রহ্মোপলব্ধি করেছেন -

''নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ

স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।''[১০৩]

- তুমি নীল পতঙ্গ, হরিদ্‌বর্ণ, লোহিতাক্ষ তড়িদ্‌গর্ভে মেঘ, ঋতুসকল, সমুদ্রসকল।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অকৃত্রিম নিসর্গচিত্রণে বাল্মীকি বোধহয় শ্রেষ্ঠ।

খাবারওয়ালা নিজের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে মিষ্টান্ন তৈরী করে এবং অদ্ভুত নামও দিয়ে থাকে। ক্রেতা অভ্যস্ত হয়ে মনে করে - এটাই আধুনিক ফ্যাশন। তাই গল্পকারের উচিত পাঠকের সুস্থ রুচির দিকে লক্ষ্য রাখা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা সাময়িক পত্র ও সাহিত্যে দেখা যায় কিন্তু আমাদের মন শুধু তৃপ্ত হয় না, বিভিন্ন রস পাঠক কামনা করে থাকে। মানুষের পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনবৃত্ত বদলে যায় সাহিত্যের বিষয়েও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সুস্থচিত্ত মানুষ মাত্রই সহজাত নিসর্গপ্রীতি আছে, পাশ্চাত্যদেশবাসীদের ও নিসর্গপ্রীতি বর্তমান, কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত নিসর্গচিত্রের জন্য ইওরোপীয় পাঠকের মনোহরণ করেছে। তাই আধুনিক বাঙালী লেখকের প্রতি প্রাবন্ধিকের আবেদন শান্তরসের এই নিসর্গচিত্র যদি সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করেন তবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিসর্গ থেকে বঞ্চিত হবে।

''নিসর্গচর্চা'তে বলেছেন, লেখকের মানুষের ওপর ঝোঁক বেড়েছে, তুলনায় পারিপার্শ্বিক জগৎ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে কৌতূহল কমেছে। ব্যতিক্রম থাকলেও এই পারিপার্শ্বিকের প্রতি নজর আরও বেশি করে দিতে বলেছেন। খানিকটা সাম্প্রতিক পরিবেশ চিন্তার ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায় প্রবন্ধটিতে।''[১০৪] ''নিসর্গ পরিবেশের সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মিক যোগ রক্ষা করা - এ সমস্তই তাঁর মূল চিন্তাসূত্র।''[১০৫] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সাহিত্য এমনকি উপনিষদেও নিসর্গ চিত্রের বিশেষ মূল্য লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। নিসর্গ চিত্র সাহিত্যে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক আমাদের সচেতন করেছেন।

ছোট গল্প বলতে কি বোঝায় (১৯৫৬)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ছোট গল্প মানে ছোট এলাচ ছোট লোক, তেমনি ছোট গল্প। কিন্তু এই উত্তরে সমস্ত জিজ্ঞাসা শেষ হয় না, আকারের সঙ্গে গুণও কেমন হয় তাও দেখার বিষয়। আধুনিক বাংলা ভাষা ইংরেজী ভাষার অনুগামী ল্যাংবোট। ইংরেজী ভাষার অনুগামী ল্যাংবোট। ইংরেজী বাংলা ভাষার উপর বর্তমানে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তাই নভেল ও স্টোরি শব্দের মানে বুঝতে হবে। Concise Oxford Dictionaryতে 'Novel' সম্বন্ধে বলা হয়েছে - ''Fictitions prose narrative of sufficient length to fill one or more volumes, portraying characters & actions representative of real life in continuous plot. এই অভিধানে story অর্থ বলা হয়েছে - tale of any length told or printed in prose or verse of actual or fictitious events, legends, myth, anecdote, novel, romance.''[১০৬]

Oxford Dictionery অনুসারে ছোট গল্প - রূপকথা, পুরাণকথা, কিংবদন্তী নকশা বা স্কেচ নভেল প্রভৃতি ছোট বড় সব আখ্যা থাকে। Novel-এ বাস্তবতুল্য মানবজীবনের একটানা বর্ণনা থাকবে। বাংলা উপন্যাসে - কয়েকজন পাত্রপাত্রীর জীবন ও চরিত্রের আনুপূর্বিক বিবরণ এবং আদি ও অন্ত্য থাকে। কিন্তু ছোট গল্পে আদি, মধ্য, অন্ত্য - যেকোন জায়গা থেকে একখণ্ড ঘটনা হলেই চলে।

ইংরেজী স্টোরি শব্দ লেখকের মতে বর্তমানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে - কৌতূহলজনক, চিত্তাকর্ষক, চিন্তার উদ্দীপক ক্ষুদ্র ঘটনা ও স্টোরি। রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার

ভূত' বনফুলের 'জ্যামিতিক গল্প ক খ গ' - নিঃসন্দেহে স্টোরি। উপন্যাস থেকে গল্পের ক্ষেত্র ব্যাপক - ''কাব্যকার আর কথাকার দুজনেই রসের ভাবক ও সঞ্চারক, যদিও তাঁদের কলাবিধি পৃথক।''[১০৭] গল্পের আকার থেকে তার বিষয় বৈচিত্র্য অসংখ্য। বহুকাল ধরে উপন্যাসে প্রেম মূল বিষয় ছিল। প্রেম মূলক বিষয় নিয়ে, ইংরেজী একটি ছড়াও উদাহরণ রূপে প্রাবন্ধিক দিয়েছেন -

Mister	Miss
Meet	Kiss
More	Kisses
Mr	Mrs

প্রাবন্ধিকের মতে, কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ছিল প্রেম তবে বর্তমানে খুন, চুরি, অপরাধ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর রহস্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। ইংরেজী গল্পের অনেক বিষয় Erewhon, Perguin, Island, Animal Farm প্রভৃতি রূপক ইংরেজী গল্প জনপ্রিয়। বাঙালী পাঠকের মধ্যে ও রুচির বৈচিত্র্য বর্তমানে বেড়ে গেছে।

সংস্কৃত ভাষায় কবি মানে কথাকার। ''যিনি রসের উপলব্ধি করেন এবং নিজ রচনার দ্বারা সেই রস অন্যের মনে-সঞ্চারিত করেন তিনিই কবি।''[১০৮] রসের ভাবক ও সঞ্চারক পৃথক কলাবিধিতে কাব্য ও কথাকার তাদের ভাব প্রকাশ করেন লেখক বলেছেন, ''যিনি নিজের নব নব রসানুভূতি ব্যক্ত করে পাঠকের রুচি প্রভাবিত করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।''[১০৯]

বিষয় বৈচিত্র্যে প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণে বনফুল কথাকারদের মধ্যে অদ্বিতীয়। বাস্তব, কাল্পনিক, অসম্ভব, রূপক, প্রতীকময় - সবধরণের রচনায় শিল্পী দক্ষহস্ত। তাই সে রচনাগুলি,

ছোট গল্প, বড় গল্প, উপন্যাস কিনা এ ধরণের বিচার নিরর্থক। গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য 'মৃগয়া' অলৌকিক রূপক 'বৈতরণী তীরে' বিচিত্র চরিত্রচিত্র - নাথুনীর মা, ছোট লোক, বিজ্ঞান, দেশী ও বিলাতী, - সবই সার্থক সৃষ্টি। কালে কালে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তিত হয়, বনফুলের ছোট গল্প সুধীজনের আকাঙ্কা তৃপ্ত করবে সেই আশা নিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''মিতহারী পাঠকও অনেক আছেন, তাদের জন্য নানাবিধ জীবনীর রসও লঘুমাত্রায় পরিবেশন করতে থাকুন।''[১১০]

এটি বনফুলকে লিখিত একটি চিঠি। 'বনফুলের গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকারূপে মুদ্রিত হয়েছিল।

বনফুলের ছোট গল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক কথাসাহিত্যের মূল দুটি বিভাগ উপন্যাস ও ছোট গল্প ইংরেজী Oxford Dictionry-তে এই দুটি অর্থ কি কি দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং দুটি বিভাগের বিশেষত্বকে ও তিনি সহজ সাবলীল ভাষায় প্রতিভাত করেছেন। ছোট গল্পের বৈচিত্র্যের মধ্যে বনফুলের গল্প যে শ্রেষ্ঠ সে কথাটা প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

গল্পের বাজার (১৯৫৭)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, মানুষ ও অন্য জন্তুর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মানুষ খাড়া হয়ে হাঁটে, আঙুল দিয়ে কলম ধরে, নেশা করে। নেশা শুধু মদ, গাঁজা আফিম নয়, পান তামাক, চাও নেশা, জীবনধারণের জন্য যা অনাবশ্যক এবং অভ্যাসে যাতে সহজে আসক্তি জন্মে, তাই নেশা। দশটি শাস্ত্রোক্ত কামজ ব্যসন বা নেশা হচ্ছে - মৃগয়া, দ্যূত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ, বেশ্যা, মদ। সদর্থে ব্যসন শব্দের প্রয়োগও দেখা

যায় ব্যসনং শ্রুতৌ অর্থাৎ বেদবিদ্যায় আসক্তি। শখ, আসক্তি, ব্যসন ও নেশা - ভাল মন্দ যাই হোক না কেন, প্রায় একই শ্রেণীতে পড়ে।

প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন পূর্বকালের জীবনযাত্রা তরজা, কবিগান, মেড়ার লড়াই, বাচখেলা, বাইনাচ প্রভৃতির থেকে বর্তমানে রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, ফুট বল-ক্রিকেট ম্যাচ - এগুলির বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বেশী। তবে সবচেয়ে ব্যাপক নেশা গল্পের বই। সাহিত্য অর্থাৎ কথাসাহিত্য, তবে সবার যে গল্পের বই এ নেশা থাকে এমত নয়। তবে অনেকের কাছেই গল্পের বই প্রবল আসক্তি বা নেশার বস্তু। জনসাধারণের গল্পপ্রীতির জন্য বাঙালী একটি সম্মানিত নূতন জীবিকা লাভ করেছে, প্রাবন্ধিকের মত, ''গল্পকার শুধু লেখক নন, কবি আর চিত্রকারের তুল্য কলাবিৎ, ইন্দ্রজালিকের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য আছে। কাল্পনিক ঘটনার বিবৃতির দ্বারা তিনি পাঠককে সম্মোহিত ও রসাবিষ্ট করেন।''[১১১]

ষাট-সত্তর বৎসর আগে বাঙলা গল্পের অভাবের সময় গল্পখোর বাঙালীর সম্বল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এগারোটি উপন্যাস, রমেশচন্দ্রের ছটি, তারকনাথের স্বর্ণলতা স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি গল্প, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি আর বউঠাকুরাণীর হাট ও আরব্য উপন্যাস। তাছাড়া কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তাছাড়া অনেক নিকৃষ্ট কবির রচনাও লোকে পড়ত। তবে গল্পের পাঠকের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল, গল্পের বই কম থাকার জন্য বর্তমান থেকে সেকালে কবিতার পাঠকের সংখ্যা অধিক ছিল। বাংলা ইংরেজী বিভিন্ন গল্পও লোকে পড়ত।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবের খবর এদেশে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে। পূর্বে উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিই নতুন বই-এর সন্ধান রাখতেন

এবং সাধারণের পাঠ্য ছিল প্রাচীন লেখকের রচনা। তখন কলেজ স্ট্রীটের বই-এর দোকানে ক্লাসিক বই ছাড়া ইংরেজী নভেল পাওয়া যেত না তাই তারা হগ মার্কেট , রেলওয়ে বুকষ্টল থেকে গল্পের বই কিনতেন। শিক্ষকদের মতে, রবিনসন ক্রুসো, গলিভার্স ট্রাভলস, রাসেলাস, ভিকার অভ ওয়েকফিল্ড, স্কট-এর বই পড়া যায় কিন্তু তাঁদের মতে ছাত্রদের অবাধ নভেল পাঠ ভাল নয়।

রেনল্ড্সের বই-এর চিহ্ন বর্তমানে প্রায় পাওয়া যায় না। প্রাবন্ধিক এই গ্রন্থাবলীর কিছু সাধারণ লক্ষণ তুলে ধরেছেন, (১) দেদার রহস্য আর রোমাঞ্চ, (২) কিছু ব্যভিচার, (৩) কিছু চুরি ডাকাতি নরহত্যা (৪) লর্ড ও লেডিদের বিলাসময় জীবনযাত্রা।

রেনল্ড্সের নায়ক-নায়িকারা রূপে গুণে অতুলনীয়, অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে অনেক কষ্টভোগের পর তাদের মিলন হয়। - "At last they were united in holy wedlock and lived happily ever after.".[১১২]

প্রাবন্ধিকের মতে, গল্প-মোটামোটি দুইভাগে বিভক্ত - প্রথম শ্রেণী - রূপকথা জাতীয়, প্লটে যতই জটিলতা এবং রোমহর্ষক ঘটনা থাকুক না কেন পরিশেষে পূর্ণ শান্তি, পাঠকরাও নিশ্চিন্ত হন, কারণ নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ একেবারে নিষ্কন্ট ক। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পে নায়ক-নায়িকা অল্পাধিক আঘাত পায়, মিলনান্ত করে গল্প শেষ হলেও পাঠকের মনে লেখক কিছু কন্টক রেখে দেন। এই শ্রেণীর গল্প সম্বন্ধে লেখক বলেছেন 'বোধহয় মনস্তত্ত্বমূলক'। উদাহরণ স্বরূপ - মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান নিষ্কন্টক গল্প কিন্তু মহাভারতের মূল আখ্যান সকন্টক দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় নিকন্টক গল্প, বিষবৃক্ষ সকন্টক কারণ নগেন্দ্র সূর্যমুখীর পূর্ণমিলন হলেও সম্পর্ক ঠিক আগের মত নয়। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবিতে শেষকালে পাত্রপাত্রীদের

দুঃখ মিটে গেছে। শেষের কবিতা সকন্টক গল্প - কেটিকে অমিত রায় বিয়ে করে কর্তব্য পালন করেছে এবং সে সঙ্গে আত্মবিসর্জনও দিয়েছে। কারণ লাবণ্যের সঙ্গে অমিত রায়ের প্রেমের যে ভাষা তা কেটির সঙ্গে মোটেই সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রের দত্তা নিষ্কন্টক গল্প কিন্তু বামুনের মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প।

এ দেশ কেন প্রায় সকল দেশের পাঠকরা চায় নায়ক নায়িকা সুখে ঘরকন্না করে and live happily ever after. ''ছোট ছেলেমেয়ের জন্য যেমন রূপকথা তেমনি অসংখ্য সাধারণ পাঠকের জন্য এমন দরকার যাতে প্রচুর আতঙ্ক আর উত্তেজনা আছে, প্রেমের লড়াইও আছে, কিন্তু যার পরিণাম নিষ্কন্ট ক।"[১৩] বিদগ্ধ পাঠকরা মানবচিত্তের ২য় শ্রেণীর সকন্ট ক গল্প অধিক উপভোগ করে থাকেন।

১৯৫৭ সালে রচিত গল্পের বাজার প্রবন্ধে মানব স্বভাবের সাধারণ অথচ প্রতি মানুষের মধ্যে বর্তমান শখ, আসক্তি, নেশা, ব্যসন - বিষয়টিতে সহমর্মিতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে এটাও দেখিয়েছেন যে তা শুধু খারাপ নয় ভালও হতে পারে। তেমনি একটি ভাল নেশা - বইপড়া - এক্ষেত্রে গল্পকারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে বিষয় নিয়ে লিখছেন সেখানে ঘটনার বিবৃতির মাধ্যমে পাঠককে সম্মোহিত ও রসাবিষ্ট করে রাখেন।

উনিশ শতকের শেষপাদ ও বিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট কথা সাহিত্য তেমন রচিত হয়নি তাই পাঠকরা ইংরেজী সাহিত্য ও কাব্যও কিছুটা পাঠ করত, বর্তমানে ইংরেজী সাহিত্য পাঠে অনীহা দেখা গেছে কারণ অনেকেই শিক্ষিত হলেও ইংরেজী সাহিত্য বুঝে উঠতে পারে না - অর্থাৎ শিক্ষিতের হার বাড়লেও সত্যকার শিক্ষিতের মান অনেকটা কমে গেছে।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন - গল্পের প্রধান

দুটি ভাগ - প্রথমতঃ যে গল্প বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়লেও শেষে একেবারে শান্তি বা নিকন্টক বলা যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পে বিচিত্র সমস্যার মধ্য দিয়ে কাহিনী যদিও আপাত একটা মীমাংসায় পৌছায় কিন্তু পাঠকের মনে একটা জের থেকে যায় বা শেষটা সকন্টক, এই গল্পকে হয়ত বা মনস্তত্বমূলক গল্প বলা যায়। প্রাবন্ধিক সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পকে মনস্তত্বমূলক না বলে 'বোধ হয়' শব্দটির প্রয়োগ করে তার বিচারের ভার পাঠকের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। গল্পপাঠে আগ্রহ দেখা দেওয়ায় যদিও বঙ্কিম চন্দ্র বলেছিলেন - ''টাকার জন্য লিখিবে না।''[১১৪] বর্তমানে পাঠকরা দাম দিতেও প্রস্তুত তাই বাঙালী একটি সম্মানিত নূতন জীবিকা লাভ করেছেন।

ইংরেজী সাহিত্যের লেখকও তাদের বৈশিষ্ট্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন।

পাঠকের রুচিবোধ বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক বলেছেন ছোটদের রূপকথা যেমন তেমনি সাধারণ পাঠক চায় এমন গল্প যাতে প্রচুর আতঙ্ক ও উত্তেজনা, প্রেমের লড়াই আছে এবং পরিণাম নিষ্টন্টক। তবে বিদগ্ধ পাঠকেরা মানবচিত্তের রহস্য এবং সমস্যাময় বাস্তবজীবনের চিত্র সম্বন্ধে আগ্রহী তারা সকন্টক গল্পও পছন্দ করেন।

সাহিত্যের পরিধি (১৯৫৭)

প্রাবন্ধিক সরস কথকতার ছলে প্রবন্ধের প্রথমে বলেছেন, রাম ও শ্যাম ঘোড়া শব্দ নিয়ে তর্ক করছে। রামের মতে, ঘোড়ার মাপ অন্তত তিন হাত। শ্যাম বলছে, ঘোড়া দেড় ইঞ্চি। মূল কথা রাম যে ঘোড়ার কথা বলছে সে ঘাস খায় এবং শ্যাম বলছে যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়। এই তর্কের কারণ হল পৃথক বস্তু বোঝাবার জন্য একই

শব্দের প্রয়োগ। শব্দের বাচ্যার্থ এক হলেও অর্থ ব্যাপ্তি সমান নয়। যেমন - যদুর মতে, ছানা, চিনি একত্রে পাক করলে সন্দেশ হয়। মধু বলছে, নাগ দে, সেন, গঙ্গু - মশাই যা তৈরী করেন তাই সন্দেশ।

তেমনি সাহিত্য শব্দের অর্থ প্রাবন্ধিক বলেছেন, বিভিন্নজন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেন - কারো মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, আবার কারো মতে শুধু রস নয়, উচ্চ আদর্শ চাই। সংস্কৃতে কাব্য ও সাহিত্য সমার্থক - তবে আধুনিক যুগে সাহিত্যের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। Concise Oxford Dictionary-তে litarature শব্দের অর্থ আছে ''writings whose value lies in beauty of form or emotional effect; the books treating of a subject; (colloq.) printed matter''[১১৫] বাঙলায় বর্তমানে সাহিত্য শব্দ ইংরেজী এই বিবৃতির অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথের তাঁর অন্তরঙ্গজনকে লেখা চিঠি ও মথুর কুন্ডর পাটের দাম জানাবার চিঠির মধ্যে প্রাবন্ধিক বলেছেন অনেক পার্থক্য আছে। তবে ভাল মন্দ তুচ্ছ যেমন চিঠি হোক না কেন তার সামান্য লক্ষণ একে অপরকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে তাই চিঠি। সাহিত্যেরও সামান্য লক্ষণ বলা যায় - একজন (একদল) বহু জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্য তুচ্ছ, প্রলাপ বিপক্ষকে গালাগালি, বিজ্ঞাপন, টেক্সট বুক, সংবাদপত্র, কবিতা, গল্প জ্ঞানগর্ভ রচনা, পাঠকসংখ্যা নগণ্য ও অগণ্য হতে পারে। আমাদের ভাললাগা কিংবা নামজাদা সমালোচক যাকে 'রসোত্তীর্ণ' বলেন তাই সাহিত্য, এটা ঠিক নয়। আধুনিক অর্থে সাহিত্য অনেক ব্যাপক।

গাড়ি বললে বড়লোকেরা মোটরকার বোঝেন। অনেক শিক্ষিতরাও সাহিত্য বলতে ললিত সাহিত্য - গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক লঘুপ্রবন্ধ ভ্রমণ কথা বোঝান। রচনাপদ্ধতি

ও ভাষা মনোহর যা ভাবের উদ্রেক করে তাই সাহিত্য। সাহিত্য দর্পনকার বলেছেন - ''রসাত্মক বাক্যই কাব্য''[১১৬] (সাহিত্য)।

Self-expression বা আত্মব্যঞ্জনার জন্য মানুষ যে নানা প্রকার চেষ্টা করে, তার একটি ফল সাহিত্য। পাঠকের রুচির মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। সরকার খাদ্য বস্তুর বা অন্য জিনিসের মান বা standard ঠিক করে দিতে পারেন কিন্তু সাহিত্যের মান বেঁধে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। পাঠকের রুচি বা প্রয়োজনানুসারে সাহিত্য প্রচলিত থাকবে।

জনপ্রিয় রচনায় উপজীব্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের আচরণ ও চিত্তবৃত্তি। অপ্রকৃত চরিত্র ও ঘট নাবলী সমাদৃত হতে পারে, যেমন - রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ, Penguin Island, Animal Farm ইত্যাদি রহস্যমূলক রোমাঞ্চকর গল্প বা ডিটেকটিভ গল্পে emotional effect এবং পাঠকসংখ্যা বেশি হলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে প্রায়ই গণ্য হয় না। ব্যতিক্রম ও দেখা যায়, Conan Doyle-এ Sherlock Holmes-এর গল্প ক্লাসিক সাহিত্যের সম্মান পেয়েছে। Lewis Carroll-এর Alice in Wonderland ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য রচিত হলেও সকল পাঠকের কাছে চিরায়ত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' ও উচ্চ শ্রেণীর রচনা।

ইংরেজী অভিধানে beauty of form or emotional effect-এর উল্লেখ আছে, কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের একটি শ্লোকে দেখা যায় -

''যানেব শব্দান্ বয়মালপামোঃ
যানেব চার্থান্ বয়মুল্লিখামঃ।
তৈরেব বিন্যাসবিশেষভব্যৈঃ
সম্মোহয়ন্তীহ কবয়ো জগন্তি।।''[১১৭]

- অর্থাৎ, আমরা যেসব শব্দ বলি, যেসব অর্থ প্রয়োগ করি, তাদেরই বিশেষ প্রকার ভব্য বিন্যাস দ্বারা কবিগণ জগৎকে সম্মোহিত করেন। তবে form বা শব্দবিন্যাসের উপর যদি অতিরিক্ত নির্ভর করা হয় তবে emotion বা রসের চেয়ে ভঙ্গী বেশি প্রকট হয়। তবে এরূপ রচনার খুব একটা স্থায়ীত্ব নেই। সাহিত্যে যে কোন নূতন পদ্ধতির প্রবর্তনকালে প্রায়ই মতভেদ দেখা যায়। কোন পদ্ধতি বর্জিত বা বহুসমাদৃত বা চিরকাল বিতর্কের বিষয় হয়েও টিকে থাকতে পারে। যেমন, শত বৎসর পূর্বে কবিতায় যমক, অনুপ্রাস, ইত্যাদি শব্দালংকারের বাহুল্য ছিল, আজ আর নেই। একদিন গদ্য কবিতা উপহাসের বিষয় ছিল, বর্তমানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আদি (বা শৃঙ্গার), হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভ্রৎস, শান্ত - অলংকারশাস্ত্রে এই নবরসের উল্লেখ আছে। অদ্ভুতের অন্তর্গত কৌতূহলও একটা রস - ডিটেকটিভ গল্পে এই রস প্রধান।

সমালোচকদের মতে, শুধু রস নয় উচ্চ আদর্শ চাই। নীতিবাক্য, উচ্চ আদর্শ, সামাজিক আদর্শ সেগুলি প্রচার যখন মূখ্য হয়ে পড়ে তখন রস শুকিয়ে যায়। রোগ, শোক, নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা, প্রতারণা, ব্যাভিচার, ভয়ানক ও বীভৎস রস জীবনে না চাইলেও - ''সাহিত্যে এ সমস্তই রসসৃষ্টির সহায়।''[১১৮]

রস কি ভাবে যোজিত হলে উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা নিরূপণের যথাযথ কোন স্থির নির্দিষ্ট পন্থা নেই। ''সাহিত্যে শান্তরস আদিরস বা বীভৎসরস, সুনীতি, দুর্নীতি, একনিষ্ঠ প্রেম বা ব্যভিচার, কত মাত্রায় থাকলে সুধীজনের উপভোগ্য হবে তার নিরূপণের সূত্র অজ্ঞাত।''[১১৯] উত্তম সাহিত্যস্রষ্টা তিনি, যাঁর রুচি অভিনব এবং বহু ভোক্তার রুচিকে নিজের রুচির অনুগত করতে পারেন।

সাহিত্যের বিচারকরা নিজের প্রতিভার জন্যই এই পদ অধিকার করেন - ''এঁরা কেবল রচনার রস বা উপভোগ্যতা দেখেন না, সমাজের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিচার করেন।''[১২০]

সাহিত্যের পরিধি'তে শব্দার্থতত্ত্ব প্রথমে আলোচনা করেছেন। একই শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলে যে সমস্যা দেখা দেয় তা তিনি কিছুটা গল্পচ্ছলে উপস্থাপন করেছেন। ''তবে এই বহু - অর্থকতার মাত্রা ও স্তর সব শব্দের ক্ষেত্রে সমান নয়। কোনো কোনো অর্থ মূলের বিভাজন, বিস্তার বা বিবর্তন, কোনো কোনো অর্থ সম্পূর্ণত ভিন্ন উৎস থেকে এসে এক শব্দের শরীরে ঢুকে গেছে, যেমন রাজশেখরের দৃষ্টান্তে 'ঘোড়া' ('চতুষ্পদ দ্রুতগামী তৃণভোজী জন্তু' আর 'যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়')। এগুলি আসলে এক শরীরে দুটি (বা তার বেশি) শব্দ।''[১২১] ঠিক সেভাবে 'সাহিত্য' শব্দটিকে ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ইংরেজী অভিধান ও সংস্কৃত অলংকারের সম্বন্ধে লেখকের গভীর জ্ঞান তাঁর স্বতঃস্ফুর্ত ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যে কোন বিষয়ই সাহিত্য সৃষ্টির উপস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। সাহিত্যের পরিধি'তে যুক্তি সম্মত ভাবেই প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন পাঠকের আনন্দ আর সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার কথা ভেবেই যে - কোনো বিষয়কেই নীতিবিরোধী হলেও সাহিত্যিক গ্রহণ করতে পারেন। তবে 'রস' ঠিক মাত্রায় কতটুকু হলে যথাযথ হয়ে উঠবে তা নিরূপণ করার মাধ্যম যদিও নির্ণিত হয় নি। তথাপি প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের 'রসোত্তীর্ণতা'র বৈচিত্র্য খুঁজেছেন। নিপুণ পাচকের মতোই স্রষ্টা পরস্পর বিরোধী উপাদান মিশিয়ে রসসৃষ্টি করেন এবং তাঁর রুচির অভিনবত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে এবং যিনি সেই অভিনবত্ব বুঝিয়ে দিতে রচনার গুণ উপলব্ধি করাতে পারেন তিনিই বড় সমালোচক।

''শেষ জীবনে লেখক (১৯৫৭) এই প্রবন্ধটিতে রাজশেখরের সাহিত্যবোধের স্পষ্ট একটা ছবি পাওয়া যায়। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থবিচার দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত লেখক সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য বিচারে পৌঁছেছেন।''[১২২]

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সাহিত্যের পরিধি লেখক যুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছ ভাষায় অঙ্কিত করেছেন।

পরিপূর্ণ সাহিত্য (১৯৫৯)

ওকালতি, ডাক্তারি, ঠিকাদারি, দালালি, ব্যবসা ইত্যাদি রোজগারের উপায় হলেও সাধারণ বাঙালী ভদ্রসন্তান চাকরিকে সর্বোত্তম জীবিকা বলে ভাবে। তেমনি সাহিত্য বলতে বাঙালীরা গল্প উপন্যাস, কবিতা, লঘু প্রবন্ধ, রম্যরচনা বোঝে। ইংরেজীতে literature অর্থে বিভিন্ন রচনা বোঝায় কিন্তু বাঙলায় সাহিত্য শব্দ অতি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনেকের মতে, বাঙলা কথাসাহিত্য ইংরেজীভাষার সমকক্ষ এবং বাঙলা ভাষা অন্যান্য ভাষার থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে।

বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে -

প্রথম শ্রেণী - উদ্‌ভাবী (কাল্পনিক), ভাবাত্মক অর্থাৎ creative এবং emotional রচনা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভক্তিগ্রন্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণী - জ্ঞানাত্মক, বাস্তব-বিষয়ক অর্থাৎ informative এবং factual যথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর', 'বিশ্বপরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্র জগৎ', চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিশ্বের' উপাদান', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' -

এগুলির গ্রন্থ ও পাঠক দুটো সংখ্যাই কম।

সমৃদ্ধ ভাষা যেমন ইংরেজীতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা আছে, যথা, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, দেশ-ভ্রমণ, সার সংকলন বা Digest, খেলা, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে পত্রিকার বৈচিত্র্য বেশী নয়, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় সব ধরণের জনপ্রিয় রচনা ছাপা হয়।

একটি Statistic-এর মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন যে বাঙলা সাহিত্যের ৮৫% উদ্‌ভাবী, কাল্পনিক বা ভাবাত্মক রচনা। ইংরেজী ভাষায় গল্প উপন্যাসের সংখ্যা বেশি কিন্তু জ্ঞানাত্মক গ্রন্থ বাংলা ভাষার মত এত অল্প নয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে চৌষট্টী কলা এবং ইংরেজী art একই অর্থে প্রযোজ্য। ''যাঁরা ছবি আঁকেন, মুর্তি গড়েন গীত - বাদ্য - নৃত্য বা অভিনয় করেন তাঁরা যেমন আর্টিষ্ট, গল্প - উপন্যাস আর কবিতার লেখকও তেমনি আর্টিষ্ট বা কলাবিৎ।''[১২৩] কারণ এদের সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্ত বিনোদন। বিনোদনের সঙ্গে অনুভূতির প্রসার ঘটলে সেটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়। জ্ঞানাত্মক বা বাস্তব বিষয়ের সাহিত্য জীবনে অপরিহার্য। কারণ, ''শিক্ষার শেষ নেই, আজীবন তা চলে।''[১২৪]

বাংলা ও হিন্দী ভাষার তুলনা করলে দেখা যায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের হিন্দী অনুবাদ বাংলা অনুবাদের আগে হয়েছিল। প্রাকৃতিক ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণেও হিন্দী ভাষা অগ্রণী। তাছাড়া হিন্দী সহিত্যের উন্নতির জন্য প্রচুর সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যে সরকারী সাহায্য অল্প - ''আমাদের অপূর্ণ সাহিত্যকে পূর্ণতা দেবার জন্য লেখক প্রকাশক পাঠক আর সরকার সকলকেই অবহিত হতে হবে।''[১২৫] ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বাঙলা হতে হবে এমন কথা নয় তবে বাঙলা সাহিত্য সকল বিভাগে পরিপূর্ণ হলে সকল বাঙালীর খুশি হওয়া উচিত।

রচনা ও রচয়িতা (১৯৫৯)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, নিত্য ব্যবহার্য বস্তুর উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন মেটানো। অনেক বস্তু প্রাচীন এমনকি তাদের উদ্‌ভাবকের নাম আমাদের জানা নেই যেমন - গাড়ির চাকা, কাপড় বোনার তাঁত, পোড়ামাটি র বাসন ইত্যাদি। আবার কতগুলি বস্তুর প্রবর্তকের নাম জানি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের স্মরণ করলেও প্রাবন্ধিক বলেছেন তাঁদের প্রবর্তিত বস্তুর পরিবর্তন করতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না কারণ এতে কাজের জিনিসকে আরও উপযুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। উদাহরণরূপে প্রথম ব্যাকরণের জন্য পাণিনি জগদ্‌বিখ্যাত হলেও পরবর্তী ব্যাকরণকারগণ পাণিনির অন্ধ অনুকরণ করেননি। বিজলী বাতির উদ্‌ভাবক এডিসন ও এয়ারোপ্লেনের সার্থক নির্মাতা রাইট - ভ্রাতৃদ্বয় চিরস্মরণীয় হলেও তাদের নির্মিত বস্তুর সঙ্গে আধুনিক বস্তুর সাদৃশ্য কম।

প্রাবন্ধিক বলেছেন - ''যেসব বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান অথবা ভাব বা রসের উৎপাদন, তার সঙ্গে রচয়িতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।''[১২৬] তাই রচয়িতা অজ্ঞাত হলেও তাঁর কৃতির উপর হস্তক্ষেপ করা অন্যায়, যেমন - অশোকস্তম্ভের সিংহমূতি, কালিদাস, শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের রচনার সংস্কার করতে চাইলে সে উন্মাদ বলে গণ্য হবে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন বেদের অপর নাম শ্রুতি, গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে শুনে বেদাধ্যয়ন হত, লিপি ব্যবহারের পরও এই পদ্ধতি বজায় ছিল তাই শুধু বাক্য নয়, উদাও অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে তার উচ্চারণ ও পঠনরীতি প্রায় যথাযথ রক্ষিত আছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, বেদের প্রতি ভারতবাসীর অসীম শ্রদ্ধা এর কারণ। বাঙলা দেশে বেদচর্চা লোপ পেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বাঙালীকে কাশী পাঠিয়ে শুদ্ধ পাঠ শিখিয়েছিলেন, তাই আজও ব্রহ্ম উপাসনায় প্রাচীন রীতিতে উপনিষদের শ্লোক উচ্চরিত হয়। তেমনি

সংস্কৃত কবিতা বাঙালী সুর করে পড়তে না পারলেও বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মরাঠী, গুজরাটী, দ্রাবিড় পণ্ডিতরা প্রায় একই সুরে সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করেন, এই চিরাগত রীতিতেও সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ দেখা যায়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাগর্থ-কে কবি কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কে আবদ্ধ বলেছেন। কবি গান রচনা করে এতে বাক্ ও অর্থের সঙ্গে সুরও সম্পৃক্ত হয় তাই কবিরচিত গানে কবিতার সঙ্গে সুরের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনের বন্ধন ঘটে । তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন রবীন্দ্রকাব্যের বাক্য পরিবর্তন যেমন গর্হিত ঠিক তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের সুরের পরিবর্তন বা অলংকরণ ও গর্হিত। ঠিক যেমন মনালিসার বাঁকা হাসি পছন্দ না হলেও কোন চিত্রবিশারদের তা সোজা করার অধিকার নেই। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন যারা রবীন্দ্র সংগীতের নতুন সুর দিতে চান তাদের উচিত অন্য গান রচনা করে নতুন সুর দেওয়া।

রচনা ও রচয়িতা প্রবন্ধে লেখক বলেন নিত্য ব্যবহার্য বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টবস্তুর পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু বেদ উপনিষদ ও সংস্কৃত কবিতা বা শ্লোক পঠনের রীতি প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে আজও বর্তমান। তেমনি প্রখ্যাত চিত্রকারের চিত্রকলা ও রবীন্দ্র রচনায় সুর, তাল, বাক্য ইত্যাদি পরিবর্তন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কারণ শিল্পে রচনা ও রচয়িতার পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কে সম্পৃক্ত। এই কথা প্রাবন্ধিক যথাযথ ভাষার মোড়কে পরিবেশন করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্য বিচার (২৬-০৪-১৯৬০)

সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করেন তাঁদেরকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা যায় - লেখক, পাঠক, সমালোচক। সাহিত্যর রচয়িতা লেখক, পাঠক উপভোগ করেন, সমালোচক

উপভোগ্যতা বিচার করেন। এই তিনজনের মানসিকতায় ঐক্য থাকে। বন্দে মাতরম্ সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উপভোগ্য হয়নি কারণ তার রূপক অনেকের সংস্কারের অনুকূল নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলতেন, ভারতীয় পুরাণ তত্ত্বে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল, বাল্মীকি কালিদাসের অনুরক্ত পাঠক, উপনিষৎ, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ও জ্ঞান ছিল। ফলতঃ কর্ণ-কুন্তী, কচ-দেবযানী, ব্রাহ্মণ, বিদায় অভিশাপ, মেঘদূত প্রভৃতি অনবদ্য সংস্কারের চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাতে অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায়।

গ্রীস রোমের পুরাণ, বাইবেল ও ইউরোপীয় ইতিহাস থেকেপাশ্চাত্য সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কার কিছুটা আয়ত্ত হলে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যে রস ভালভাবে উপভোগ করা যায় তেমনি ভারতীয় সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে ভারতীয় সাহিত্য উপভোগ করা সহজ হয়ে উঠে।

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী বা রবীন্দ্রানুসারী তাঁদের রচনাতেও ভারতীয় সংস্কার আছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রায়ই ভারতীয় সংস্কার বর্জন করে আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব এবং গ্রীস-রোমের পুরাণ কথাও উল্লেখ করেন। নব্য রীতি প্রবর্তনের কারণ - গতানুগতিকতায় বিতৃষ্ণা ও আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যরীতির প্রতি অনুরাগ। তাছাড়াও আর একটি কারণ হল, এঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে প্রগতির বাধা মনে করে তার যথোচিত চর্চা করেন নি। পূর্ববর্তী কবিদের সংস্কার থেকে পরবর্তী কবিরা প্রায় বঞ্চিত। ''রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ, মেঘদূত' - প্রভৃতির তুল্য রচনা এঁদের আদর্শের অনুরূপ নয় সাধ্যও নয় - 'এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত, ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে''[১২৭] - এই অনুপ্রাসময় ছন্দকে আধুনিক কবিরা সেকেলে মনে করেন। এই কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব অস্বীকার করেন না তবে আদর্শও মনে করেন না।

বাঙালী সমাজের একটি শাখা ইঙ্গবঙ্গ নামে খ্যাত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে নূতন শাখা তাকে ইওরোবঙ্গ নাম দিলে ভুল হবে না। - ''সাহিত্যের মার্গ বহু ও বিচিত্র, কালধর্মে নূতন নূতন মার্গ আবিষ্কৃত হবেই।''[১২৮]

প্রাচীন ও নবীন - এই দুই শাখায় নিষ্ঠাবান লেখক, পাঠক, সমালোচক আছেন। একে অপরের সমালোচনা করতে গেলে পক্ষপাতিত্ব অসম্ভব নয়। বাঙালী সমালোচকরা সমগ্র বাংলা কাব্য বিচারের চেষ্টা করেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রচনার তুলনামূলক সমালোচনা ভারতীয় বা বিদেশী ভাল-শিক্ষিত পণ্ডিতদের পক্ষেও সহজ নয়।

রবীন্দ্রকাব্যের দোষদর্শী সমালোচকরা প্রায় সবাই প্রাচীনপন্থী ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্য ও পাশ্চাত্যকাব্যের তুলনাত্মক নিরপেক্ষ বিচার করার মত প্রতিভাবান সাহিত্যিক কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। মধুসূদন দত্ত, প্রমথ চৌধুরীর মত প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরা হয়ত তা করতে পারতেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যে যার জ্ঞান নেই তাঁর পক্ষে তুলনাত্মক বিচারের চেষ্টা না করাই উচিত।

সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসুর মতে সাহিত্যের সার্থকতা লেখক পাঠক ও সমালোচকের মাধ্যমে যথার্থতা লাভ করে। ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন সংস্কার সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান ও গভীরতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ব্যপ্তি ও বিশালতা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ, গ্রহণ, আদর্শের মত সাহিত্যে কলম ধরার সাধ্য প্রায় অনেকেরই ছিল না। আধুনিকরা পাশ্চাত্য কবিদের অনুসরণ করেন ভারতীয় ঐতিহ্যকে তারা প্রগতির বাধাস্বরূপ মনে করতেন। রবীন্দ্র কাব্য ও পাশ্চাত্যকাব্যের তুলনাত্মক বিচার করার মত পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথই, তাঁর বিশালতা ও ব্যপ্তি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ যেন এক শ্রদ্ধাবনত ভক্তের আরতি স্বরূপ।

তথ্যসূত্র -

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১)		কথা সাহিত্য রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা		শ্রাবণ ১৩৬০	৫৯১
২)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	৩
৩)	তদেব				৪
৪)	তদেব				৫
৫)	তদেব				৫
৬)	তদেব				৫
৭)	তদেব				৬
৮)	তদেব				৬
৯)	তদেব				১৫

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১০)	মজুমদার উজ্জ্বল কুমার	করতলে নীলকান্তমণি	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯	১ম ১৯৮৮	১১২
১১)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	১৯
১২)	তদেব				১৯
১৩)	তদেব				২১
১৪)	তদেব				২১
১৫)	তদেব				২২
১৬)	তদেব				২৩
১৭)	তদেব				২৬
১৮)	তদেব				২৭
১৯)	তদেব				২৮

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
২০)	মজুমদার উজ্জ্বল কুমার	করতলে নীলকান্তমণি	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯	১ম ১৯৮৮	১১৬
২১)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	১৯
২২)	তদেব				৭৮
২৩)	তদেব				৭৯
২৪)	তদেব				৭৯
২৫)	তদেব				৮০
২৬)	তদেব				৮০
২৭)	তদেব				৮০
২৮)	তদেব				৮১
২৯)	তদেব				৮১

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৩০)	মজুমদার উজ্জ্বল কুমার	করতলে নীলকান্তমণি	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯	১ম ১৯৮৮	১১৬
৩১)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	২০
৩২)	তদেব				৮৪
৩৩)	তদেব				৮৪
৩৪)	তদেব				৮৪
৩৫)	তদেব				৮৪
৩৬)	তদেব				৮৫
৩৭)	তদেব				৮৫
৩৮)	তদেব				৮৫
৩৯)	তদেব				৮৬

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৪০)	তদেব				৮৭
৪১)	তদেব				৮৭
৪২)	তদেব				৪০২
৪৩)	তদেব				৪০২
৪৪)	তদেব				১২৮
৪৫)	তদেব				১২৯
৪৬)	তদেব				১২৯
৪৭)	তদেব				১৩০
৪৮)	তদেব				১৩১
৪৯)	তদেব				১৩১
৫০)	তদেব				১৩২
৫১)	তদেব				১৩২
৫২)	তদেব				১৭১
৫৩)	তদেব				১৭২
৫৪)	তদেব				১৭২

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৫৫)	তদেব				১৭৪
৫৬)	তদেব				১৭৪
৫৭)	তদেব				১৭৫
৫৮)	তদেব				১৭৭
৫৯)	তদেব				১৯৩
৬০)	তদেব				১৯৪
৬১)	তদেব				১৯৫
৬২)	তদেব				১৯৬
৬৩)	তদেব				১৯৭
৬৪)	তদেব				১৯৮
৬৫)	তদেব				১৯৯
৬৬)	তদেব				১৯৯
৬৭)	তদেব				২০১
৬৮)	তদেব				২০৪
৬৯)	তদেব				২০৪

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৭০)	তদেব				২০৪
৭১)	তদেব				২০৮
৭২)	তদেব				২১১
৭৩)	তদেব				২১১
৭৪)	তদেব				২০
৭৫)	মজুমদার উজ্জ্বল কুমার	করতলে নীলকান্তমণি	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯	১ম ১৯৮৮	১১৬
৭৬)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	২৩৭
৭৭)	তদেব				২১
৭৮)	তদেব				২৯৪
৭৯)	তদেব				২৯৫

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৮০)	তদেব				২৯৬
৮১)	তদেব				২৯৬
৮২)	তদেব				২৯৮
৮৩)	তদেব				২৯৮
৮৪)	তদেব				২৯৯
৮৫)	তদেব				৩০
৮৬)	তদেব				৩০
৮৭)	তদেব				৩১
৮৮)	তদেব				৩২
৮৯)	তদেব				৩২
৯০)	তদেব				৮৮
৯১)	তদেব				৮৯
৯২)	তদেব				৯০
৯৩)	তদেব				৯১
৯৪)	তদেব				৯১

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৯৫)	তদেব				৯২
৯৬)	মজুমদার উজ্জ্বল কুমার	করতলে নীলকান্তমণি	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯	১ম ১৯৮৮	১১৫
৯৭)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	৩৯৬
৯৮)	তদেব				৩৯৭
৯৯)	তদেব				৪০০
১০০)	তদেব				
১০১)	তদেব				২১৫
১০২)	তদেব				২১৫
১০৩)	তদেব				২১৬
১০৪)	তদেব				১১৫

ক্র.নং লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১০৫)তদেব				১৯
১০৬)তদেব				৩৮৭
১০৭)তদেব				৩৮৯
১০৮)তদেব				৩৮৮
১০৯)তদেব				৩৮৯
১১০)তদেব				৩৮৯
১১১)তদেব				২৪৭
১১২)তদেব				২৪৯
১১৩)তদেব				২৫০
১১৪)তদেব				২৪৬
১১৫)তদেব				২৫১
১১৬)তদেব				২৫২
১১৭)তদেব				২৫৩
১১৮)তদেব				২৫৫
১১৯)তদেব				২৫৫

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১২০)	তদেব				২৫৬
১২১)	তদেব				১৫
১২২)	মজুমদার উজ্জ্বল কুমার	করতলে নীলকান্তমণি	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯	১ম ১৯৮৮	১১৩
১২৩)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	৩০২
১২৪)	তদেব				৩০২
১২৫)	তদেব				৩০৩
১২৬)	তদেব				৩১৩
১২৭)	তদেব				৩০০
১২৮)	তদেব				৩৩০